মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়’ *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৪৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٥، عدد : ١، صفر و ربيع الأول ١٤٤٣هـ/ أكتوبر ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বানিয়াবাসী মসজিদ, বুলগেরিয়া। দেশটির রাজধানী সোফিয়ায় অবস্থিত এই মসজিদটি ১৫৬৬ সালে ওছমানীয় শাসনামলে নির্মিত হয়।

دعوتنا

١ – تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين–

٢ – نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية–

٣ – نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء–

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ | ১ম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউয়াল	১৪৪৩ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪২৮ বাং
অক্টোবর	২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা | সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৫ম কিস্তি)* ০৭
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ঈদে মীলাদুন্নবী : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১৪
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - ঈদে মীলাদুন্নবী ১৯
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
  - ছিয়ামের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ ২১
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা ২৫
    -অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **মনীষী চরিত :**
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ৩০
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **হকের দিশা পেলাম যেভাবে**
  - তোর মতো ছালাত পড়া তো জীবনে কোথাও দেখিনি ৩৫
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- **চিকিৎসা জগৎ :**
  - বিদেশী ফলের বিকল্প দেশী কোন ফল ৩৮
- **ক্ষেত-খামার :** ৩৯
  - শিক্ষার্থীদের পরিচর্যায় গড়ে উঠছে যে কলেজের কৃষি খামার ধারণা বদলে দিয়ে দিনাজপুরে গলদা চিংড়ি চাষে সাফল্য
- **কবিতা :** ৪০
  - প্রার্থনা
  - পর্দা
  - জ্ঞান
  - মুসলিম মুজাহিদ
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আবহাওয়াগত বিপর্যয় রোধে ব্যবস্থা নিন!

বর্তমান বিশ্ব চরম আবহাওয়া বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পরাশক্তিগুলির অধিক শিল্পায়নের কার্বন নিঃসরণের ফলে আবহাওয়া পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল সহ বাংলাদেশ এখন ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, খরা-দাবানল, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, পাহাড় ধস, সমুদ্র সৈকতে খাদ সৃষ্টি, নদীভাঙন, কৃষিজমিতে লবণাক্ততার আগ্রাসন প্রভৃতি অসংখ্য দুর্যোগের মুখোমুখি এখন আমাদের এই সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ। সেই সাথে সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন মৃদু ভূমিকম্প ভবিষ্যৎ বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশ চিরায়ত ষড়ঋতুর একটি চমৎকার আবহাওয়ার দেশ। অথচ তার এই আদি চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। এখন বর্ষায় বৃষ্টি ঝরে কম। 'শ্রাবণীধারা' শব্দটি বইয়ে আছে, বাস্তবে নেই। অথচ প্রাক-বর্ষা ও বর্ষা-উত্তর অকাল বর্ষণে দীর্ঘায়িত হচ্ছে বর্ষাকাল। বাতাসে জলীয়বাষ্পের আধিক্য থাকায় গ্রীষ্মের খরতাপ অসহনীয়ভাবে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এর বিপরীতে শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল পঞ্জিকায় থাকলেও তা আলাদা করে চেনা যায় না বা জনজীবনে তেমন কোন অনুভূতি সৃষ্টি করেনা। এর ফলে হ্রাস পাচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা ও কমে যাচ্ছে ভূমির উৎপাদনশীলতা। মানুষের স্বাস্থ্যের উপরে পড়ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ম্যাজমেজে ভাব ও অলসতা জেঁকে বসছে সর্বত্র। উদ্যমী, বিচক্ষণ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

প্রতিবছর নদীভাঙন ঠেকাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু স্থায়ীভাবে টেকসই কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ২০০৯ সালে 'আয়লা' দুর্গত খুলনার কয়রা ও সাতক্ষীরার আশাশুনি অঞ্চল আজও স্থায়ী বাঁধের মুখ দেখেনি। এবার ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর প্রভাবে এইসব এলাকা পুনরায় বিধ্বস্ত হয়েছে। সেখানে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত পানি উঠে এসে ভূমির উর্বরাশক্তি নষ্ট করছে। সাথে সাথে সুপেয় পানির অভাবে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে বসবাস করছে অসহায় মানুষ।

১৯৬১-৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মুহাম্মদ আযম খান (১৯৬০-১৯৬২) কক্সবাজার যেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে ৬০ কি.মি. দীর্ঘ মযবুত বেড়িবাঁধ এবং ২৫ কি.মি. দীর্ঘ উঁচু সড়ক নির্মাণ করেন ও উদ্বোধন করেন। যা কুতুবদিয়ার প্রধান অবকাঠামো। আজও মানুষের মুখে তাঁর অবদানের কথা শোনা যায়। দ্বীপে 'আযম খান কলোনী' তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ইতিমধ্যে উক্ত বেড়িবাঁধের অনেকটা ভেঙ্গে গেছে এবং বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বলা হচ্ছে, ১০ বছর পরের কুতুবদিয়া হবে শিল্পায়ন ও জ্বালানী সম্পদের কুতুবদিয়া। অথচ ২১৫ বর্গ কিলোমিটারের এই ছোট্ট দ্বীপে ২০১১ সালের হিসাবে ১ লক্ষ ৩৩ হাযার ৮৮৮ জন বসবাস করেন। যার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬২০ জন। অথচ প্রতিবেশী ভারতের ২১,০৮৭ বর্গ কি.মি. আয়তনের মিজোরাম প্রদেশে প্রতি বর্গ কি.মিটারে জনঘনত্ব মাত্র ৫২ জন। শিল্পায়ন ও বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলা হ'লে দ্বীপের এই বিপুল সংখ্যক বসবাসকারী যাবে কোথায়? কিভাবে তাদের কর্মসংস্থান হবে? সবাই কি শিল্পকারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারী হবে? যুগ যুগ ধরে পৈত্রিক পেশায় অভ্যস্ত লবণচাষী, মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবীদের অবস্থা কি হবে? সর্বোপরি অধিক শিল্পায়নে কার্বন নিঃসরণের ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হবে। যা জাতীয় দুর্যোগ ডেকে আনবে। তাই বিষয়টি সরকারের এখনই ভেবে দেখা উচিৎ। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রবণ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমের সাতক্ষীরা এবং সর্ব দক্ষিণ-পূর্বের কুতুবদিয়ার বর্তমান অবস্থা এই। বাকীগুলির অবস্থা সহজে অনুমেয়। বরং দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের ন্যায় দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বের উন্মুক্ত সাগরে সৌর প্যানেল বসানোর প্রকল্প গ্রহণ করা উচিৎ। যাতে সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতে কুতুবদিয়াকে আলোকিত করা যায় এবং বায়ুদূষণ শূন্যে নেমে আসে। একইভাবে অন্যান্য সমুদ্র বন্দরকেও আলোকিত করা যায়।

গত ৪ঠা আগস্ট বুধবার দুপুরে চাঁপাই নবাবগঞ্জে পদ্মা নদীর তেলিখাড়ি ঘাটে বজ্রপাতে ১৭ জনের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। সম্ভবতঃ এটাই দেশে বজ্রপাতে এযাবৎকালের সর্বাধিক একত্রিত মৃত্যুর ঘটনা। বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য বর্তমান বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। স্যাটেলাইট ও উন্নত প্রযুক্তির থাণ্ডারস্টর্ম ডিটেকটিভ সেন্সরের মাধ্যমে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়ে প্রাণহানি কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমান সরকারের আমলে প্রথমে ১০ লাখ ও পরে ১ কোটি তালগাছ লাগানো হয়েছে। অথচ রাস্তার ধারে তার নমুনা পাওয়া যায় না। প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বজ্রপাতপ্রবণ দেশগুলিতে বজ্রপাত সতর্কীকরণ অ্যাপ চালু হয়েছে। বজ্রপাতের আশঙ্কা দেখা দেওয়ার আধাঘন্টা বা একঘন্টা আগেই অ্যাপের মাধ্যমে সতর্ক সংকেত পাচ্ছে মানুষ। আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে, বাংলাদেশে ১৩টি নদী বন্দরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বজ্রপাতের সংকেত ও সংখ্যা নিরূপণের যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু হ'লে ঝড়-বৃষ্টির সময় কোন যেলায় বজ্রপাত হ'তে পারে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারবে আবহাওয়া দফতর। এমনকি ১০ মিনিট থেকে আধা ঘণ্টা আগে বজ্রপাতের সংকেত দেওয়া যাবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই সেন্সর বসানো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, নওগাঁর বদলগাছি, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনার কয়রা এবং পটুয়াখালী সহ মোট ৮টি স্থানে। একেকটি সেন্সরের সীমা ২৫০ কি.মি.। প্রতিটি সেন্সর থেকে ১০০০ কি.মি. পর্যন্ত মনিটরিং করা যাবে। আবহাওয়া দফতরের দাবী অনুযায়ী, তাতে পুরো দেশের চিত্র উঠে আসবে। তাছাড়া বিমান বাহিনীর রাডার ব্যবহার করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এসব সেন্সর যন্ত্রের যথাযথ মনিটরিং এবং সতর্কবার্তা সাধারণ মানুষের কাছে সময়মত পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

দেশের সর্বাধিক বজ্রপাত প্রবণ এলাকা হ'ল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ যেলার হাওর এলাকা সহ বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও মধ্যাঞ্চলের বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল। তবে অন্যান্য এলাকাও মুক্ত নয়। অতএব সর্বত্র বজ্রপাত সতর্কতা ও পূর্বাভাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি বজ্রপাত নিরোধ ব্যবস্থা ও আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা আবশ্যক। এজন্য দেশের মোবাইল ফোন টাওয়ারগুলিতে আর্থিং পদ্ধতি যুক্ত করা যায়। সেই সাথে বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলিতে 'লাইটেনিং অ্যারেস্টার' বসানো এবং কংক্রিটের তৈরী বজ্রপাত আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা যরূরী। সর্বোপরি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে দেশে ঈমানী পরিবেশ গড়ে তোলা কর্তব্য। নইলে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আঃ)। তাঁদের থেকেই দুনিয়াতে মানুষ বিস্তার লাভ করেছে *(নিসা ৪/১)*। সে হিসাবে পৃথিবীর সকল মানুষ ভাই ভাই। আদর্শিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মুসলমানরা ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর *(হজ্জ ২২/৭৮)*। সুতরাং যেদিক দিয়েই বিবেচনা করা হোক না কেন পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। তাই মানুষ একে অপরকে কিংবা এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কষ্ট দিতে পারে না। কারণ পরস্পরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ নিবন্ধে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।-

মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ :

মুসলমানকে কষ্ট দিতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا، ‘অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে’ *(আহযাব ৩৩/৫৮)*। মুমিনকে কষ্ট দিতে নিষেধ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَحْلِهِ،

‘হে ঐ জামা‘আত! যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ, কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মযবূত হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে আল্লাহ তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভিতরে অবস্থান করে থাকলেও’।[১]

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যম :

মানুষকে প্রধানত কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে গালি দেওয়া, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী করা, খোঁটা দেওয়া, তুচ্ছ জ্ঞান করা ইত্যাদি বোঝায়। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে যুলুম করা, ধোঁকা-প্রতারণা, রাস্তা বন্ধ করা, সম্পদ জবর দখল করা ও হত্যা করা ইত্যাদি বুঝায়।

১. *তিরমিযী হা/২০৩২; মিশকাত হা/৫০৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৯।*

ক. কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া :

আঘাতের ক্ষত ও ব্যথা দ্রুত সেরে যায়। কিন্তু কথার মাধ্যমে দেওয়া আঘাত ও ক্ষতের নিরাময় সহজে হয় না। সেজন্য কবি বলেন,

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِئَامُ * وَلاَ يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

‘তরবারির আঘাতের ক্ষতের প্রতিষেধক আছে, কিন্তু জিহ্বার ক্ষতের কোন প্রতিষেধক নেই’।[২] তাই কথার মাধ্যমে দেওয়া আঘাত মানুষ সবচেয়ে বেশী স্মরণে রাখে এবং এ আঘাত সর্বাধিক ব্যথাতুর হয়। কথার দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. গালি দেওয়া :

মানুষকে গালি দেওয়া হ’লে সে কষ্ট পায়। আর এটা কবীরা গোনাহ। পরকালে এর প্রতিকার হবে নেকী প্রদান বা গোনাহ বহনের মাধ্যমে। তাছাড়া কাউকে গালি দেওয়া গোনাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী’।[৩] মুসলমানকে গালি দেওয়া নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَابُّ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ، ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিপতিত করার ন্যায়’।[৪] উভয় গালিদাতাকে রাসূল (ছাঃ) শয়তান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ، ‘উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে’।[৫]

কোন মুসলিমকে গালি দিলে শয়তানকে সহযোগিতা করা হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ পানকারী জনৈক ব্যক্তিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করা হ’ল। তিনি আদেশ দিলেন, ওকে তোমরা মার। আবূ হুরায়রা বলেন, (তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা তাকে মারতে আরম্ভ করলাম।) আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা মারতে লাগল, কেউ তার জুতা দ্বারা, কেউ নিজ কাপড় দ্বারা। অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন কিছু লোক বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لاَ تَقُولُوْا هَكَذَا لاَ تُعِينُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ‘এরূপ বলো না এবং ওর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না’।[৬]

২. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/১৭৩; মিরক্বাত ৩/৫৯ পৃঃ।*
৩. *বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।*
৪. *বায্যার, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৮০।*
৫. *আহমাদ হা/১৭৫২২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৬৯৬।*
৬. *বুখারী হা/৬৭৭৭; আবূদাঊদ হা/৪৪৭৭; মিশকাত হা/৩৬২৬।*

গালিদাতাদের মধ্যে যে প্রথমে শুরু করবে সব গোনাহ তার উপরে বর্তাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، 'পরস্পর গালিগালাজকারীর মধ্যে যে প্রথমে আরম্ভ করে উভয়ের দোষ তার উপর বর্তাবে, যতক্ষণ না অপরজন সীমালঙ্ঘন করে'।[৭] এমনকি গালিদাতা পরকালে নিঃস্ব হবে এবং নেকী দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামত দিবসে ছালাত, ছিয়াম, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হ'তে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎ আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৮] সুতরাং মুসলমানকে গালি দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে পরকালে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হ'তে না হয়।

২. গীবত-তোহমত :

গীবত-তোহমতের মাধ্যমেও মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। গীবত অর্থ দোষচর্চা, পরনিন্দা। আর তোহমত অর্থ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। এ দু'টিই পরিবারে ও সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী। মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্কে চিড় ধরাতে এদু'টি বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ দু'টি গোনাহ সমাজের মানুষ হেসে-খেলে করে থাকে। এমনকি অনেকে একে দোষের মনে করে না। অথচ উভয়টিই কবীরা গোনাহ ও বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ এ গোনাহ মাফ করবেন না। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের ইয্যত-সম্মান নষ্ট হয়, তার হক বিনষ্ট হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। অনেকে দোষচর্চা করে মনে করেন যে, তিনি সঠিক কথাইতো বলছেন। সুতরাং সেটা দোষের হবে কেন? কিন্তু কারো মধ্যে থাকা দোষ-ত্রুটি তার অবর্তমানে আলোচনা করাই গীবত। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

'তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপসন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যা আমি বলি? তিনি বললেন, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে, তার মধ্যে সে দোষ-ত্রুটি থাকলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান না থাকে, তবে তুমি মিথ্যারোপ করলে'।[৯]

গীবত বা দোষচর্চা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'আর একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ– 'হে ঐসব লোক! যারা কেবল মুখে ঈমান এনেছ। কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না'।[১০]

পার্থিব শাস্তি : রাসূল (ছাঃ) পার্থিব শাস্তির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে গেলে একে অপরের খিদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন লোক ছিল যে তাদের খিদমত করত। তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর জাগ্রত হ'লে লক্ষ্য করলেন যে, সে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেনি (বরং ঘুমিয়ে আছে)। ফলে একজন তার অপর সাথীকে বললেন, এতো তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর ন্যায় ঘুমায়। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমাদের বাড়িতে ঘুমানোর ন্যায় ঘুমায় (অর্থাৎ অধিক ঘুমায়)। অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে বললেন, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বল যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) আপনাকে সালাম প্রদান করেছেন এবং আপনার নিকট তরকারী চেয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও, তাদেরকে আমার সালাম প্রদান করে বলবে যে, তারা তরকারী খেয়ে নিয়েছে। (একথা শুনে) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকট তরকারী চাইতে ওকে পাঠালাম। অথচ আপনি তাকে বলেছেন, তারা তরকারী খেয়েছে। আমরা কি তরকারী খেয়েছি? তিনি বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশত দিয়ে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোশত দেখতে পাচ্ছি। তারা

৭. *মুসলিম হা/২৫৮৭; আবূদাঊদ হা/৪৮৯৪; মিশকাত হা/৪৮১৮।*
৮. *মুসলিম হা/২৫৮১; তিরমিযী হা/২৪১৮; মিশকাত হা/৫১২৭।*
৯. *মুসলিম হা/২৫৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৮৬; ছহীহাহ হা/১৪১৯।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; তিরমিযী হা/২০৩২; মিশকাত হা/৫০৪৪।*

বললেন, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, না বরং সেই তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[১১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, আপনার জন্য ছাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছাফিয়া বেঁটে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহ'লে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে'।[১২]

ক্বায়েস বলেন, আমর ইবনুল আছ (রাঃ) তার কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ ভ্রমণ করছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যা ফুলে উঠেছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! কোন ব্যক্তি যদি পেট পুরেও এটা খায়, তবুও তা কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চেয়ে উত্তম'।[১৩]

পরকালীন শাস্তি : রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে গীবতের পরকালীন শাস্তি সম্বন্ধেও অবহিত করেছেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَمَّا عُرِجَ بِى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِى أَعْرَاضِهِمْ– 'মি'রাজে গিয়ে আমাকে এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল যাদের নখগুলি সব ছিল পিতলের। যা দিয়ে তারা তাদের মুখ ও বুক খামচাচ্ছিল। আমি জিব্রীলকে বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, যারা মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ গীবত করত এবং তাদের সম্মান নষ্ট করত'।[১৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার বিনিময়ে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দণ্ডায়মান হবেন'।[১৫]

তোহমত বা অপবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، 'যে ব্যক্তি কোন অপরাধ কিংবা পাপ করে, অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপায়, সে নিজেই উক্ত অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপভার বহন করবে' *(নিসা ৪/১১২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، 'মিথ্যা তো কেবল তারাই রচনা করে যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী' *(নাহল ১৬/১০৫)*।

৩. চোগলখুরী করা :

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে চোগলখুরী করা। আর তা হচ্ছে দুই ভাই বা বন্ধুর মাঝে সম্পর্ক বিনষ্টের উদ্দেশ্যে একে অপরের কাছে পরস্পরের দোষ উল্লেখ করা। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِىَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ.

'মিথ্যা অপবাদ কি জিনিস আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তা হচ্ছে চোগলখুরী করা। জনসমক্ষে কারো সমালোচনা করা'।[১৬] আরেকটি হাদীছে এসেছে, আব্দুর রহমান ইবনু গানম ও আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ–

'আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তা'আলার নিকৃষ্ট বান্দা তারা, যারা মানুষের পরোক্ষভাবে নিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকেদের পদস্খলন প্রত্যাশা করে'।[১৭] অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ. قَالُوْا بَلَى. قَالَ فَخِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ. قَالُوا بَلَى. قَالَ فَشِرَارُكُمُ الْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ.

'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? ছাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি

---

১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮।*
১২. *আবূদাঊদ হা/৪৮৭৫; মিশকাত হা/৪৮৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৪।*
১৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩২, সনদ ছহীহ।*
১৪. *আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮-৭৯; মিশকাত হা/৫০৪৬; ছহীহাহ হা/৫৩৩।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৩৪।*
১৬. *মুসলিম হা/৬৮০২।*
১৭. *আহমাদ হা/১৭৯৯৮; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৭০৮; ছহীহাহ হা/২৮৮৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৪; মিশকাত হা/৪৮৭১-৭২।*

বলেন, যাদের দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, যারা চোগলখুরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়'।[১৮]

চোগলখুরীর পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ : بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ– 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা বা মক্কার একটি বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দু'টি কবর থেকে দু'জন মানুষের শব্দ শোনেন, যাদেরকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এ দু'টি কবরে আযাব হচ্ছে। তবে সেটি তেমন বড় কোন কারণে নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এদের এক ব্যক্তি পেশাব থেকে আড়াল (সতর্কতা অবলম্বন) পর্দা করত না এবং অন্য ব্যক্তি চোগলখুরী করত'।[১৯]

৪. মন্দ নামে ডাকা :

মানুষকে মন্দ নামে ডাকা তাকে কষ্ট দেওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ، 'আর তোমরা একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

জুরাইরা ইবনুয যাহহাক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বনী সালিমাহ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'তোমরা একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদের মাঝে আগমন করেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দু'-তিনটা করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে অমুক! এভাবে ডাকলে তারা বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! থামুন, সে ব্যক্তি এ নামে ডাকলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হ'ল 'তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না'।[২০]

৫. উপহাস করা :

কোন মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সবারই কোন না কোন দিক দিয়ে দুর্বলতা থাকে। তাই কোন মানুষকে উপহাস করা উচিত নয়। এতে মানুষ মনে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، 'হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

৬. তুচ্ছজ্ঞান করা :

কোন মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করলে বা হেয় ভাবলে সে যারপর নাই কষ্ট পায়। এ কাজ থেকে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এবং এর অশুভ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাক্বওয়া এখানে, এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার স্বীয় বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। কোন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল ও ইয্যত-আব্রু হারাম'।[২১]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ. 'সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মানহানি করা'।[২২]

(চলবে)

---

১৮. আহমাদ হা/২৭৬৪২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২৩, সনদ হাসান।
১৯. বুখারী হা/২১৬; মুসলিম হা/২৯২; মিশকাত হা/৩৩৮।
২০. আবূ দাঊদ হা/৪৯৬২; ইবনু মাজাহ হা/৩৭২১।
২১. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৮৫।
২২. আবূদাঊদ হা/৪৮৭৬; ছহীহাহ হা/১৪৩৩, ৩৯৫০; ছহীহুল জামে' হা/২২০৩, ২৫৩১; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৩।

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৫ম কিস্তি)

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ওহাবী মুজাহিদদের অবদান

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ কি বিদ্রোহজনিত সংগ্রাম ছিল? নাকি কোন সঠিক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য জিহাদের একটি অংশ ছিল? নাকি জাতিগত যুদ্ধ ছিল? এ নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। তবে তা যে জিহাদ আন্দোলন থেকে ভিন্ন ছিল, সেটি খুবই পরিষ্কার। এজন্য কিছু লোক মনে করেন, মুজাহিদরা যেহেতু একটি দ্বীনী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাই তারা এই জাতিগত যুদ্ধে অংশ নেননি।[১] কিন্তু আরেক দল পর্যবেক্ষকের মতে এ জাতিগত যুদ্ধে ওহাবী মুজাহিদগণ তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে অংশ নিয়েছিলেন। ঘটনাবলীর আলোকে এ মতই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কেননা ১৮৫৭ সালেও মুজাহিদদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ ও সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যার উল্লেখ উইলিয়াম হান্টার তার The Indian Musalmans গ্রন্থে *(উর্দূ অনুবাদ : হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান)* করেছেন। গোলাম রসূল মেহেরও 'সারগুযাশ্তে মুজাহিদীন' গ্রন্থে মুজাহিদদের সেসব যরূরী কাজকর্মের উল্লেখ করেছেন যা অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে তারা আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[২] এছাড়া খালীক আহমাদ নিযামীও ওহাবী মুজাহিদদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কথা যারা তুলেছেন তাদের দাবী প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। তিনি '১৮৫৭ সাল কা তারিখী রোযনামচা' (১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক দিনলিপি) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আন্দোলনে (অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলনে) কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণকারী অনেককেই সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। বখত খাঁ সম্পর্কে আমাদের ধারণা হ'ল, তিনিও মুজাহিদীন জামা'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাহাদুর শাহের মামলা চলাকালে তাকে 'ওহাবী আক্বীদা' পোষণকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। যে কেউই হান্টারের The Indian Musalmans পড়েছেন তিনিই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ঐ সময়ে ওহাবী শব্দ সাইয়েদ ছাহেব ও তার সমমনা আলেমদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হ'ত। আর হান্টারের কথা মতে তো 'ওহাবী' ও 'বিদ্রোহী' সমার্থক ছিল। বখত খাঁ আলেমদের সাথে যেভাবে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতেন তাতেও এটা ফুটে ওঠে যে, তিনি সাইয়েদ ছাহেবের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আন্দোলনে অংশ নিতে তিনি যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন একশ' জন আলেম তার সাথী হয়েছিলেন। সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে টোংক থেকে ওহাবী আলেমদের একটি দল তার কাছে এসেছিলেন। এছাড়াও জয়পুর, ভূপাল, ঝাঁসী, হাসারা ও আগ্রা থেকে বহু আলেম তার পাশে ছুটে এসেছিলেন... মাওলানা লিয়াকত আলী এলাহাবাদীও এই চিন্তাধারার মুজাহিদ বলে মনে হয়... মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী, যার চেষ্টায় মর্দানে ৫৫ নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল। তিনি তো সাইয়েদ ছাহেবের খলীফা এবং মুজাহিদ জামা'আতের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শহীদে আলীগড় মাওলানা আব্দুল জলীল ছিলেন সাইয়েদ ছাহেবের অন্যতম খলীফা। তিনি সাহসিকতার সাথে ইংরেজ শক্তির মুকাবিলা করেছিলেন। উল্লেখিত নামকরা ক'জন ব্যক্তি বাদেও ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরো অনেকেই সাইয়েদ ছাহেবের জামা'আতের লোক অথবা সমমনা মানুষ ছিলেন। আর সম্ভবত এই কারণেই কিছু লোক ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে মুসলমানদের সংগ্রাম বলে অভিহিত করে থাকেন।[৩]

জনৈক ইংরেজ লেখকের রায়ের প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, ওহাবীরা এ আন্দোলনে সামনে-পিছনে সব সারিতে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে হিন্দুস্থানে ইংরেজদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ওহাবীদের কঠোর সাজা দিয়েছিল এবং এ চিন্তাধারার লোকদের (চাকুরী, ব্যবসায় ইত্যাদি থেকে) তাড়িয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ওহাবীদের এই কঠোর সাজা প্রদানই প্রমাণ করে যে, ওহাবীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৪]

'হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক' (হিন্দুস্থানে ওহাবী আন্দোলন) বইয়ের লেখকও ১৮৫৭ সালে ওহাবী মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডের কম-বেশী বর্ণনা প্রদান করেছেন।

মোটকথা এ আলোচনার উদ্দেশ্য, ১৮৩১ সালে শহীদায়েনের শাহাদাতের পরে ছাদেকপুরী পরিবার জিহাদের পতাকা ও আন্দোলনের নেতৃত্ব যেভাবে সামাল দিয়েছিলেন তা স্বাধীনতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের নেতৃত্ব যদিও ওহাবী মুজাহিদদের হাতে ছিল না, কিন্তু তারা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মাওলানা বাটালভী ও আহলেহাদীছ জামা'আত : একটি সংশয় নিরসন

কিছু লোক বলেন যে, 'ওহাবী' দ্বারা শুধু আহলেহাদীছ উদ্দেশ্য নয়; বরং মাযহাব-সম্প্রদায় নির্বিশেষে যারাই

---

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

১. *হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক, পৃ. ৬৯, নতুন সংস্করণ, লাহোর।*

২. *সারগুযাশ্তে মুজাহিদীন, পৃ. ২৯১-৩০১।*

৩. *১৮৫৭ সাল কা তারিখী রোযনামচা, পৃ. ১৫-১৬, নাদওয়াতুল মুছান্নিফীন, দিল্লী।*

৪. *১৮৫৭ সাল কা তারিখী রোযনামচা, পৃ. ১৫-১৬।*

ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তারা সবাই ওহাবী। এতে হানাফী-অহানাফী সবাই শামিল রয়েছেন। সত্য এই যে, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর জীবদ্দশায় নিঃসন্দেহে হানাফী-আহলেহাদীছ উভয়েই আন্দোলনে শরীক ছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে হানাফীরা ধীরে ধীরে আন্দোলন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। যেমন মৌলভী মাহবূব আলী দেহলভী[৫], মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী[৬] প্রমুখ।

বালাকোটের দুঃখজনক ঘটনার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাদেকপুরী পরিবারের হাতে এসে গিয়েছিল। তারা ছিলেন হাদীছ অনুযায়ী আমলকারী তথা আহলেহাদীছ। এই পরিবার ও তাদের চিন্তাধারার লোকেরাই একশ' বছরের বেশী সময় ধরে এই জিহাদ আন্দোলনকে জীবিত রেখেছিলেন। এমনকি 'ওহাবী' (আহলেহাদীছ) ও 'বিদ্রোহী' সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে পরবর্তীকালে ওহাবী শব্দটি আহলেহাদীছ জামা'আতের লোকদের জন্যই খাছ হয়ে যায় এবং ওহাবী শব্দ দ্বারা সর্বদা আহলেহাদীছদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এমনি করে ওহাবী শব্দটি আহলেহাদীছের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, যিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলেহাদীছের চিন্তা-চেতনার বিপরীত মত পোষণ করতেন, তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় সরকারের নিকট থেকে এই সিদ্ধান্ত পাশ করান যে, আহলেহাদীছকে যেন আহলেহাদীছ বলা হয়, তাদেরকে যেন ওহাবী বলা না হয়। (এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ প্রয়োজন) তা সত্ত্বেও অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। কেননা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মরহূমের ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকারকে আহলেহাদীছ জামা'আত মেনে নেয়নি এবং সমষ্টিগতভাবে তারা জিহাদ আন্দোলনে শামিল ও মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতায় সদা সচেষ্ট ও তৎপর থাকে। এজন্যই 'ওহাবিয়াত' পরিভাষার মধ্যে শির্ক, বিদ'আত ও জাহেলী রসম-রেওয়াজ উচ্ছেদের সাথে সাথে ইংরেজ বিরোধিতাও শেষ অবধি থেকে যায়। এ কারণেই আহলেহাদীছ জামা'আতের লোকজন ইংরেজ সরকারের চোখে সর্বদা কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে এবং তাদের ধর-পাকড়ের ধারা আগে যেমন ছিল তেমনই চলতে থাকে। যেমনটা কাযী আব্দুর রহীম মরহূমের ভাষায় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে যে, প্রত্যেক আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মুওয়ায্যিন অথবা খাদেম হিসাবে ইংরেজ কর্মচারীরা গুপ্তচরবৃত্তি করত। এছাড়াও সাইয়েদ সুলায়মান নাদভীর স্বীকারোক্তিও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীর যিন্দেগী পর্যন্ত আহলেহাদীছ জামা'আতের মধ্যে জিহাদের রূহ কার্যকর ছিল। মাওলানা রহীমাবাদী ১৯১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কাযীকোট (গুজরানওয়ালা)-এর 'বোম কেস'-এর ঘটনা ১৯২১ সালে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে আহলেহাদীছের লোকদের সাজা দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, মাওলানা আব্দুল ক্বাদের ক্বাছূরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী, মাওলানা আব্দুর রহীম বিন মাওলানা রহীম বখশ ওরফে মাওলানা মুহাম্মাদ বশীর শহীদ, আমীরুল মুজাহিদীন ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (রহঃ) ছাড়াও আরো অনেকে পরবর্তীতে জিহাদের পবিত্র মিশনকে জীবিত রেখেছিলেন এবং এ পথের সকল বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন। যার কিছু বিবরণ 'মুশাহাদাতে কাবুল ওয়া ইয়াগিস্তান', 'সারগুযাশ্তে মুজাহিদীন' ও অন্যান্য বইয়ে পাওয়া যাবে। 'সারগুযাশ্তে মুজাহিদীন' গ্রন্থে এ বিবরণ ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরবর্তীকালে মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতার বেশীর ভাগ কাজ আহলেহাদীছ জামা'আতের লোকেরাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত রেশমী রুমাল আন্দোলনের সরকারী রিপোর্ট সংবলিত আসল যে দলীল-দস্তাবেয 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ' বা শায়খুল হিন্দের আন্দোলন নামে ছাপা হয়েছে তাতেও আহলেহাদীছ ব্যক্তিবর্গ ও আলেমদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ঐ দলীল-দস্তাবেযে আহলেহাদীছ ব্যক্তিবর্গ ও আলেমদেরকে সবখানে 'ওহাবী মৌলভী', 'গোঁড়া', 'উন্মাদ' ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কোন হানাফীকে ওহাবী বলা হয়নি। *(এর বিস্তারিত বিবরণ রেশমী রুমাল আন্দোলন শিরোনামে সামনে আসছে।)*

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীও এ কথা স্বীকার করেন যে, জিহাদ আন্দোলনে গায়ের মুক্বাল্লিদদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বরং তার মতে জিহাদ আন্দোলনে ব্যর্থতার কারণ এই একটা জিনিসই।

---

৫. *মৌলভী মাহবূব আলী শুধু একাই জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাননি, বরং জিহাদ আন্দোলনের বিরোধিতার পাশাপাশি আরেকটি কর্মক্ষেত্র দাঁড় করেন। এভাবে তিনি আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি করেন। এজন্য মাওলানা মুহাম্মাদ জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন, 'মৌলভী মাহবূব আলীর এ বিপথগামিতার ফলে জিহাদী কর্মকাণ্ডের উপর যে আঘাত লেগেছিল তেমন আঘাত আন্দোলনের সৈনিকরা আজ পর্যন্ত কোন শিখ কিংবা দুর্রানীর হাতে লাভ করেননি' (হায়াতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ২৩৬, নাফীস একাডেমী, করাচী)।*

৬. *মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর একজন খলীফা। কিন্তু আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি ইংরেজ সরকারকে সমর্থন জানান এবং জিহাদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদান করেন (তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃ. ৩৯৬, উর্দূ অনুবাদ : মুহাম্মাদ আইয়ুব কাদেরী)। এ ফৎওয়া মূলত একটি বক্তৃতা, যা মাওলানা ছাহেব এক সেমিনারে প্রদান করেছিলেন। যার সারাংশ 'ইসলামী মুযাকারায়ে ইলমিয়াহ' নামেই মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি তার বক্তৃতায় হিন্দুস্থান 'দারুল হারব' (যুদ্ধক্ষেত্র) হওয়ার আক্বীদা কেবল ওহাবীদের আক্বীদা বলে সাব্যস্ত করেন এবং বলেন যে, সকল হানাফীর মতে হিন্দুস্থান 'দারুল ইসলাম' (দেখুন : মুযাকারায়ে ইলমিয়াহ, পৃ. ৯, নওলকিশোর ছাপা, লাক্ষ্ণৌ, ১৮৭০)। ইংরেজ লেখক জেমস্ উকেন্‌লির বর্ণনা অনুযায়ী, 'মৌলভী কারামত আলী বৃটিশ সরকারের সাহায্যকারী এবং ওহাবীদের কট্টর বিরোধী ছিলেন'। মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভীর উক্তি মতে, 'আক্বীদা ও আমলের দিক হ'তে তিনি সাইয়েদ আহমাদের প্রধান সহযোগীদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিলেন' (হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক, পৃ. ৪৭, পাদটীকা দ্র.)।*

মাওলানা সিদ্দীর ধারণার সমালোচনা করতে গিয়ে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী লিখেছেন, 'মাওলানা সিদ্দীর মতে, সাইয়েদ আহমাদ শহীদের আন্দোলন সফল না হওয়ার কারণ এটাই মনে হয় যে, এতে শাওকানিয়াত, ওহাবিয়াত অথবা আরো পরিষ্কার করে বললে, গায়ের মুক্বাল্লিদিয়াতের সংমিশ্রণ ঘটেছিল'।[৭]

মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী মাওলানা সিদ্দীর এ মত সম্পর্কে বলেন, 'এই আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহীদের মধ্যে ফিক্বহী ঝগড়া-ঝাটি অথবা জোরে আমীন ও রাফ'উল ইয়াদায়েনের মাধ্যমে বিদ'আত উৎখাত কিংবা সুন্নাতের অনুসরণের চিন্তা কখনোই স্থান পায়নি। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ ও অন্যান্য যারা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের লেখা বই-পুস্তক, বক্তৃতা-বিবৃতি, তর্ক-বিতর্ক, পত্রাবলী ইত্যাদি মওজুদ আছে। সেসব থেকে দলীল দিতে হবে। জিহাদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আক্বীদা-বিশ্বাসের সংস্কার, আমল সংস্কার, তাওহীদের প্রচার-প্রসার, বাতিল খণ্ডন, অবৈধ রসম-রেওয়াজের অবসান ঘটানো এবং ইসলামী বিধি-বিধান চালু করা। বাকী যেসব কথা তাদের নামে বলা হয় তা দু'একজনের কথা, যা এ ক্ষেত্রে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ... তবে এটা হ'তে পারে যে, এ আন্দোলন ইত্তেবায়ে সুন্নাতের যে জায্বা সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাবে বর্তমানে প্রাপ্ত হাদীছের গ্রন্থগুলিতে প্রথমবারেই যা সুন্নাত বলে নযরে ধরা পড়ে তা গ্রহণ করতে কিছু লোককে কোন তাক্বলীদী চিন্তা বিরত রাখতে পারেনি'।[৮]

মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভীর এই পর্যালোচনা বড়ই বাস্তবসম্মত ও যাচাইকৃত। নিঃসন্দেহে ওহাবী মুজাহিদগণ ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলকে ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যম বানাননি। তারা জিহাদের উপরেই তাদের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এ কারণেই আহলেহাদীছ জনগণ ছাড়াও তারা অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তারপরেও এ সত্য অনস্বীকার্য যে, যেহেতু তারা নিজেরা ছিলেন হাদীছ অনুযায়ী আমলকারী এবং তাক্বলীদী জড়তা থেকে দূরে, সেহেতু তারা যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের যে যে মজলিসেই তাদের কথা বলা ও প্রভাব ফেলার সুযোগ মিলেছিল, সেখানে সেখানেই তাওহীদ ও সুন্নাতের মশাল জ্বলে উঠেছিল এবং তাক্বলীদের বন্ধন ভেঙ্গে খানখান হয়ে গিয়েছিল। আর জিহাদ আন্দোলনের এই দিকটাই মাওলানা সিদ্ধী ও অন্যান্যদের গাত্রদাহ ও অন্তর্জ্বালার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!

তাই মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী যদিও 'ওহাবী'র পরিবর্তে 'আহলেহাদীছ' শব্দের ব্যবহার সরকার থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার এ চেষ্টা জিহাদ আন্দোলনের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। আহলেহাদীছ জামা'আতের লোকেরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদ আন্দোলনে উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় ছিলেন। সুতরাং মাওলানা বাটালভীর চেষ্টায় আহলেহাদীছ জামা'আতের মোড় ইংরেজ বিরোধিতার পরিবর্তে ইংরেজ আনুগত্যের দিকে ফিরে যাওয়ার দাবী একেবারেই অবাস্তব।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী গুজরানওয়ালা (রহঃ) এই একই বিষয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আহলেহাদীছের পক্ষ থেকে ইংরেজদের সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য কোন আওয়ায যদি উঠে থাকে তবে তা ছিল মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মরহূমের আওয়ায। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এ আওয়াযে মাওলানা একাই ছিলেন। এটি তার ব্যক্তিগত মত ছিল। অবিভক্ত হিন্দুস্থানের উল্লেখযোগ্য কোন আহলেহাদীছ এ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সাথে সহমত পোষণ করেননি। বরং যে সময়টায় মাওলানা তার পুস্তিকা ও লেখনীতে ইংরেজদের সহযোগিতা করে চলছিলেন, ঠিক সে সময়েই হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবে আহলেহাদীছ জামা'আতের বুযর্গগণ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর আন্দোলন সফল করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কোন গযনভী ও লাখভী খান্দান অথবা ছাদেকপুরী, রহীমাবাদী ও ক্বাছূরী বুযর্গদের কেউ কি মাওলানা বাটালভীর পক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন? সুতরাং মাওলানা বাটালভীর কাজকে আহলেহাদীছ জামা'আতের সমষ্টিগত কাজ বিবেচনা করলে বাস্তবতার উপর যুলুম করা হবে'।[৯]

একইভাবে এ কথাও সম্পূর্ণ অসত্য যে, ওহাবী মুজাহিদীন বলতে হানাফী-আহলেহাদীছ উভয়কেই বুঝায়। বরং সত্য এই যে, ওহাবী দ্বারা কেবল আহলেহাদীছকে বুঝানো হয়েছে, অন্য কাউকে নয়।

মোটকথা, এই বিবরণের উদ্দেশ্য এ সত্য তুলে ধরা যে, সাইয়েদায়েনের শাহাদাতের পর এই জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনকে যারা জীবিত রেখেছিলেন এবং এজন্য নিজেদের জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন কেবলই আহলেহাদীছ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর যখন ১৯১৯ সালে ও তার পরবর্তীকালে 'খেলাফত আন্দোলন', 'অসহযোগ আন্দোলন', 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' 'আহরার' ইত্যাদির মতো ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠন সমূহের সূত্রপাত হল, তখন সেগুলিতে অবশ্য দেওবন্দী আলেমদের দেখা মিলতে লাগল। তখনো কিন্তু আহলেহাদীছ আলেমরাও প্রতিটি আন্দোলনে দেওবন্দী বুযর্গদের সাথে সমানভাবে শরীক থেকেছেন। উল্লেখিত আন্দোলন ও সংগঠনগুলির রিপোর্ট দেখলেই তা বুঝা যাবে। তাতে অবশ্যই মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ

৭. *মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩, পৃ. ৯৯।*
৮. *ঐ, পৃ. ৯৯।*
৯. *মাসিক রাহীক্ব, লাহোর, অক্টোবর ১৯৫৭, পৃ. ১০৫-১০৬।*

বেনারসী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার সহ আহলেহাদীছ জামা'আতের আরো অনেক আলেম ও ব্যক্তির নাম পাওয়া যাবে।

একইভাবে ক্বাছূরী বংশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যেমন মাওলানা আব্দুল ক্বাদের ক্বাছূরী, তার পুত্র-পৌত্রগণ, তথা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী, মাওলানা মুহিউদ্দীন আহমাদ ক্বাছূরী প্রমুখের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় খিদমতকে কে ভুলতে পারে? এই গুরুজনেরা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি আন্দোলনে জানমালের অমূল্য কুরবানী পেশ করে গেছেন। কবির ভাষায়,

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

'পাক-পবিত্র স্বভাবের এই প্রেমিকজনদের উপর মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন'! আমীন!

জিহাদ আন্দোলন ও হানাফী আলেমগণ

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় এ কথার স্পষ্ট খণ্ডন হয়ে গেছে যে, হানাফী আলেমগণও কোন পর্যায়ে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাস্তবতা এই যে, সাইয়েদ আহমাদ শহীদের জীবদ্দশায় যদিও হানাফী *(ঐ সময়কার হানাফীরা দেওবন্দী বা ব্রেলভী হানাফী অবশ্যই ছিলেন না। তারা ছিলেন অলিউল্লাহী হানাফী, যাদের মাঝে তাক্বলীদী গোঁড়ামি ছিল না)* ও আহলেহাদীছ উভয় গোষ্ঠীর লোক এ আন্দোলনে শরীক ছিল বলে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এ আন্দোলনের সকল নেতৃত্ব তারাই দিয়েছিলেন যারা তাক্বলীদের বন্ধন থেকে শুধু মুক্তই ছিলেন না; বরং তাদের তাবলীগ ও প্রচারের ফলে তাক্বলীদের শৃঙ্খল টুটে যাচ্ছিল এবং হাদীছ অনুযায়ী আমলের প্রতি আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলশ্রুতিতে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যত ধর-পাকড় হয়েছে, যত সহায়-সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত হয়েছে এবং যত শাস্তি-সাজা হয়েছে তার তালিকার শীর্ষে ছাদেকপুরী পরিবারের নাম আসবে। এ পথে এই পরিবার যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছেন, যে যে বালা-মুছীবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা ভাষায় বর্ণনাতীত।(এ বিষয়ের যরূরী বিবরণ মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভীর 'হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে)। এই বেদনাবিধুর বিবরণে ও জিহাদের ইতিহাসে কোথাও হানাফী আলেমদের নাম নযরে আসে না। কিন্তু ছাদেকপুরী পরিবারের উদ্যমী মর্দে মুজাহিদগণ এ পথে তাদের সব কিছু কুরবানী দিয়েছিলেন। তাই হানাফী সাধকদের উদ্দেশ্যে এ পরিবার যথার্থই বলতে পারেন কবির ভাষায় :

کامل اس فرقۂ زُہاد سے اٹھا نہ کوئی

جو چند ہوئے تو یہی رندان قدح خوار ہوئے

'এই সাধক দলের মাঝে কামেল কেউ আবির্ভূত হননি। দুয়েকজন যারা হয়েছেন তারা সাধনায় একেবারে বুঁদ হয়ে গিয়েছেন'।

হানাফী লেখকদের মনগড়া ইতিহাস :

এটা বড়ই দুঃখজনক যে, আজকাল হানাফী লেখকগণ হানাফী আলেমদের (১৮৫৭ সালের) স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরপুরুষ বানানোর চেষ্টা করেন। অথচ বীরপুরুষ হওয়া তো দূরের কথা, তারা এ যুদ্ধে মোটে অংশই নেননি। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ আসলে জিহাদ আন্দোলনের অংশ ছিল কি-না, তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। কেননা তাতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই শামিল ছিল। কিন্তু তার আগে ও পরে যে জিহাদ আন্দোলন অব্যাহত ছিল তা ছিল এক নির্ভেজাল দ্বীনী আন্দোলন। এ আন্দোলন ইংরেজদের হয়রান-পেরেশান ও বেহাল দশা করে ছেড়েছিল এবং এ জিহাদ আন্দোলনই ছিল হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইল ফলক। এই জিহাদ আন্দোলনে ১৮৫৭ সালের পরে হানাফী আলেমগণ কবে কোথায় শরীক ছিলেন? তারা কি ধরনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন? কি কি বালা-মুছীবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন তারা হয়েছিলেন? কে আছেন যিনি তাদের নাম-ঠিকানা তুলে ধরতে পারবেন? তার প্রমাণ যোগাড় করতে পারবেন?

শামেলী যুদ্ধের ঘটনা :

খুব কষ্ট করে প্রমাণ করা এক ঘটনা হল শামেলী যুদ্ধের ঘটনা। এ যুদ্ধে যেন ক্বিয়ামত বয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ অংশ নিয়েছিলেন- এমনি ধারার জোরালো প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়। এমনকি এ ঘটনার ভিত্তিতে দেওবন্দী আলেমদের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের হিরো প্রমাণ করা হয়। কিন্তু প্রথমত এ যুদ্ধের যে বর্ণনা বর্তমানকালে তুলে ধরা হয় তা আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়। এ যুদ্ধে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানূতুভী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, হাফেয যামেন শহীদ ও তাদের পীর মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জোরেশোরে উল্লেখ করা হয়। অথচ এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর প্রথম জীবনী লেখক মাওলানা আশেক এলাহী মীরাঠী 'তাযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থে শামেলী ও তার পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তাতে এ ঘটনা যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের কোন অংশ ছিল তার নিশ্চয়তা মেলে না। বরং সে বিবরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শামেলীর এ ঘটনা ছিল মূলত ফাসাদী বা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী মুরব্বীদের লড়াই। *(তাযকিরাতুর রশীদ-এর ভাষায় ১৮৫৭ সালের রাজনৈতিক হাঙ্গামায় অংশগ্রহণকারীদের ফাসাদী বা দাঙ্গাবাজ বলা হয়েছে।)* সেই লড়াইয়ে দুই 'ফাসাদীর' গুলীতে হাফেয যামেন শহীদ হন। কিন্তু সরকারকে এ ঘটনার ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়। যার ভিত্তিতে মাওলানা নানূতুভী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। মাওলানা নানূতুভী ও মাওলানা গাঙ্গুহী আত্মগোপন করেন, কিন্তু হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব লুকিয়ে মক্কায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর মাওলানা গাঙ্গুহীর মামলা চালু হ'লে তিনি

আদালতে তার যবানবন্দীতে বলেন, 'আমরা এই দাঙ্গাবাজদের থেকে যোজন যোজন দূরে'। ফলতঃ আদালতেও তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। আবার আদালতের দৃষ্টিতেও তারা জিহাদের অপরাধে 'অপরাধী' গণ্য হননি। এজন্য তাদেরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

'তাযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থকারের উল্লেখিত বিবরণ সম্পর্কে আজকাল দেওবন্দী হানাফীরা বলেন যে, উক্ত জীবনীকার ইংরেজদের ভয়ে ঘটনার চিত্র সম্পূর্ণ উল্টোভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে ঘটনা ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তিনি কৌশল ভেবে তা ইংরেজদের পক্ষে বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে দেওবন্দী আলেমগণ ইংরেজদের ধর-পাকড় থেকে রেহাই পান এবং কোন ক্ষেত্রে তারা যে ইংরেজ বিরোধী কাজকর্মে অংশ নিয়েছিলেন তা অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু প্রথমত একজন বিশ্বস্ত জীবনী লেখক থেকে আশা করা যায় না যে, তিনি কোন ঘটনা এমনভাবে বিকৃত করবেন যে তার আসল রূপই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ যখন দাবী করা হচ্ছে যে, দেওবন্দী আলেমগণ জিহাদ আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন তখন তা গোপন করার উদ্দেশ্য কী? তার স্পষ্ট উদ্দেশ্য তো এই যে, উল্লেখিত মুরব্বীদের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পর তারা এক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন করলে তখনই কেবল শামেলীর ঘটনা গোপন করা তাদের জন্য মানানসই হ'ত এবং ইংরেজরাও বুঝত যে, দেওবন্দের বর্তমান প্রজন্ম এখন যেভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে পঠন-পাঠনে ব্যস্ত রয়েছেন, তাদের প্রথম দিকের বুযর্গরাও একই কাজে মশগুল ছিলেন।

'তাযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থকারের বর্ণনা যদি 'কৌশল' বলে ধরে নেওয়া হয় তাহ'লেও নিশ্চিত রূপে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, মাত্র একটি ঘটনাতে সীমিত পরিসরে শুধু কয়েকজন মুরব্বী জিহাদী তৎপরতায় অংশ নিয়েছিলেন। ব্যস এতটুকুই! না এর আগে কোন যুদ্ধে তারা তৎপরতা দেখিয়েছেন, না পরে।

মাওলানা মানাযির আহসান গীলানীর বর্ণনা :

শামেলীর ঘটনার যে চিত্র আজকালকের হানাফীরা প্রমাণ করতে চান তা সঠিক হলেই কেবল তাদের বর্ণিত কাহিনী সত্য হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবতা তো এই যে, শামেলীর ঘটনাকে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং মুজাহিদ আন্দোলনের অংশ প্রমাণ করাই অসম্ভব। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী' নামে মোটা মোটা তিন খণ্ডে মাওলানা নানূতুভীর যে জীবনী লিখেছেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মাওলানা নানূতুভী এবং তার ধর্মীয় ও শিক্ষাজগতের সাথী-বন্ধুদের কোন ভূমিকা ছিল না। উক্ত গ্রন্থে তিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার কিছু উদ্ধৃতি নিচে প্রদত্ত হ'ল :

'আজকাল শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণতা, গৌরব ও মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক অঙ্গনে যিনি যত বড় ভূমিকা পালন করেন তিনি তত বড় মাপের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হন। অন্যান্য ময়দানে তার ভূমিকা যাই হোক না কেন, তিনি যে মর্যাদারই অধিকারী হোন না কেন নিজেকে রাজনৈতিক ময়দানের খেলোয়াড় প্রমাণ করতে না পারলে তিনি কিছুই নন। এই সাধারণ মানদণ্ড দেখে কোন বাছ-বিচার না করে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না যে, সিপাহী বিদ্রোহের আগুনে আমাদের নেতা ও মহান ইমামও (মাওলানা নানূতুভী) ঠিক সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যেভাবে দেশের সাধারণ জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমাদের নেতা ও মহান ইমামের নীতি অনুসারে এ ধরনের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক নয় এবং ঘটনাবলী থেকেও তার সমর্থন মেলে না'।[১০]

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'এতটুকু কথা সর্বাবস্থায় নিশ্চিত এবং চাক্ষুস সাক্ষ্যের দাবী মতে অনস্বীকার্য যে, অন্যান্যদের সাথে বিদ্রোহের হাঙ্গামা ছড়িয়ে দিতে আমাদের নেতা ও মহান ইমাম এবং তার ধর্মীয় ও শিক্ষাজগতের সাথী-বন্ধুদের হাত থাকার দাবী কল্পনার ফানুস ছাড়া কিছু নয়। আর এমন উড়ো কথার কোন মূল্য নেই। বরং ঘটনা তাই যা গ্রন্থকার আশেক এলাহী মিরাঠী লিখেছেন, 'মাওলানা ফাসাদীদের থেকে বহু যোজন দূরে ছিলেন'।[১১]

শামেলীর ঘটনার আসল চিত্র :

রটনা যখন এত তখন শামেলীর ঘটনার আসল চিত্র কি ছিল? তার বিবরণ মাওলানা গীলানী এভাবে তুলে ধরেছেন যে, থানাভুনের কিছু লোককে স্থানীয় ইংরেজ শাসকরা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। তাদের মধ্যে কাযী পরিবারের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে তার বড় ভাই এতই ব্যথিত হন যে, জীবনের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকজন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করে, যারা ভুল তথ্যের কারণে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবার ও উত্তরাধিকারীরা মযলূম। এই মযলূমদের সাহায্য করা এবং যালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যরূরী। এজন্য তারা তাদের নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে স্থানীয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাতে ঐ মুরব্বীগণও (দেওবন্দের আলেমগণ) অংশ নিয়েছিলেন।

---

১০. *সাওয়ানিহে ক্বাসেমী, ২/৮৯ পৃ.।*

১১. *ঐ, পৃ. ১০৯। [যারা যে ঘটনা থেকে যোজন যোজন দূরে তাদেরকে সেই ঘটনার নায়ক বানানো সত্যের অপলাপ ছাড়া কি হ'তে পারে?- সম্পাদক]।*

মাওলানা গীলানীর ভাষ্য মতে, অনেকটা নিম্নের হাদীছ তামিল করতে গিয়ে তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের হেফাযত করতে গিয়ে নিহত হ'ল সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত করতে গিয়ে নিহত হ'ল সে শহীদ'।[১২]

এ যুদ্ধে যেহেতু কিছু ইংরেজ নিহত হয়েছিল তাই পরবর্তীতে মাওলানা নানূতুভীসহ কতিপয় লোককে বেশ কয়েকবার গোপনে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মাওলানা নানূতুভী প্রতিবারই অস্বাভাবিক ও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। তারপরেও এই সন্দেহজনক অবস্থা ১৮৬১ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর ইংরেজ সরকার তাকে বিপজ্জনকদের তালিকা থেকে বাদ দেয়।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতটুকুই, যাকে মাওলানা গীলানী তার নিজস্ব শৈলী অনুযায়ী একটু বিস্তারিত লিখেছেন। শেষে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'যাহোক প্রাথমিক কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে যদিও থানাভুনের এই জিহাদী আন্দোলন ছিল প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে একটি স্থানীয় আন্দোলন, তথাপি দেশের নাগরিকদের জান-মাল-ইয্যত রক্ষার যে আইনগত চুক্তি জনগণের সঙ্গে সরকারের ছিল, থানাভুনের লোকদের বেআইনি ফাঁসি দিয়ে সে চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে সরকার চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করেছিল। ফলে এলাকার বাসিন্দারা প্রতিশোধ গ্রহণের কুরআনী নির্দেশ পালন করতে উদ্দীপিত হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। একইভাবে এর প্রভাব ও পরিণামের দিক দিয়ে এ আন্দোলনের সীমানা আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশী দূর ব্যাপ্তি লাভ করেনি'।[১৩]

হানাফী আলেমগণ ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে কেন অংশগ্রহণ করেননি?

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন চলছিল হানাফী আলেমগণ তাতে শরীক ছিলেন না। শামেলীর ঘটনারও জিহাদ আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। তা ছিল কেবল যালেম শাসকের বিরুদ্ধে মযলূম প্রজাদের সীমিত পরিসরে এক খণ্ডযুদ্ধ। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে হানাফী আলেমগণ জিহাদ আন্দোলন থেকে কেন দূরে ছিলেন? তারা ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে কেন অংশ নেননি? এ প্রশ্নের উত্তর তো তারাই ভাল দিতে পারবেন। তারপরেও এর একটি কারণ মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সেটি উল্লেখ করছি। মানাযির আহসান গীলানী মরহূম এ কথা বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং নিজে নওয়াব ছদর ইয়ার জঙ্গ (১৯০৫-১৯৪৪), মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী (১৮৬৬-১৯২৬), ছদরুছ ছুদূর, আছাফিয়া সরকার (হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্য)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। তিনি লিখছেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছিলেন তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীও (১৭৯৩-১৮৯৫) ছিলেন। হঠাৎ একদিন মাওলানাকে দেখা গেল, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন এবং জনৈক চৌধুরী, যিনি বিদ্রোহীদের দলের সেনাপতিত্ব করছিলেন তার নাম ধরে বলতে বলতে যাচ্ছেন,

لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں

'আরে যুদ্ধ করে কি হবে? আমি তো খিযির (আঃ)-কে ইংরেজদের কাতারে দেখতে পাচ্ছি'। নওয়াব ছাহেবই আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, 'বিদ্রোহ অবসানের পর গঞ্জেমুরাদাবাদের জনশূন্য মসজিদে গিয়ে হযরত মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান অবস্থান করছিলেন। ঘটনাক্রমে যে রাস্তার ধারে মসজিদটি অবস্থিত সেই রাস্তা ধরে কোন কারণে ইংরেজ সেনারা যাচ্ছিল। মাওলানা মসজিদ থেকে তাদের দেখছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল যে, তিনি মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন এবং ইংরেজ বাহিনীর ঘোড়ার লাগাম, খুঁটো ইত্যাদি হাতে থাকা এক সহিসের সঙ্গে আলাপ করে আবার মসজিদে ফিরে এলেন। এখন স্মরণ নেই যে, জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে, নাকি তিনি নিজে থেকেই বলেছিলেন, যে সহিসের সাথে আমি কথা বলেছি তিনি হলেন খিযির। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ অবস্থা কেন? জওয়াবে বললেন, ফায়ছালা এমনই হয়েছে'।[১৪]

নিজেদের বুযর্গদের কাশ্ফ ও তাদের গায়েবী বিষয়াদি জানার প্রতি বিশ্বাসে দেওবন্দী হানাফীরা ব্রেলভী হানাফীদের চাইতেও চার ধাপ এগিয়ে। এজন্য তাদের এক বুযর্গের রূহানী কাশ্ফের মাধ্যমে যখন হযরত খিযির (আঃ) কর্তৃক ইংরেজদের কেবল সহযোগিতা ও সাহচর্য দান নয়; বরং ইংরেজ সেনাদের একজন মামুলী খাদেম (সহিস) হওয়ার কথা জানা গেছে, তখন তার পরিষ্কার উদ্দেশ্য তো জানাই গেল যে, ইংরেজ বাহিনী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ ও সাহায্যপ্রাপ্ত। অতএব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে হানাফী আলেমরা কিভাবে যুদ্ধে লড়বেন? তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে কেনইবা তারা আল্লাহ্র গযবের শিকার হবেন?

ইংরেজ গভর্ণরের এক বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষ্য :

ঘটনা এই হোক আর যাই হোক, এ সত্য অস্বীকারের কোন উপায় নেই যে, সমষ্টিগতভাবে হানাফী আলেমগণ জিহাদ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন এবং তাতে তারা অংশ নেননি। দেওবন্দের বুযর্গদের জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রমাণ সেই বিশেষ প্রতিনিধির (মিস্টার

১২. *আবুদাঊদ হা/৪৭৭২, মিশকাত হা/৩৫২৯।*
১৩. *সাওয়ানিহে ক্বাসেমী, ২/১৩৯ পৃ.।*
১৪. *সাওয়ানিহে ক্বাসেমী, ২/১০৩ পৃ.।*

পামর) বিবরণ থেকেও মেলে, যাকে ১৮৭৫ সালে ইংরেজ সরকার দারুল উলূম দেওবন্দ পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার রিপোর্টে লিখেছিলেন,

یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار و ممد و معاون سرکار ہے- یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن ہیں کہ ایک دوسرے سے کچھ واسطہ نہیں-

'এই মাদ্রাসা সরকার বিরোধী নয়, বরং সরকার সমর্থক এবং সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা এতটা স্বাধীন ও বিনয়ী যে তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কোন সম্পর্ক নেই'।[১৫]

এছাড়াও ডব্লিউ উইলিয়াম হান্টার রচিত The Indian Musalmans *(উর্দূ অনুবাদ : হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান)* থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে। যে সকল লোক ও জামা'আত ইংরেজ সরকারের বিরোধী এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যরূরী মনে করে তাদের পরিচয় তুলে ধরাই ছিল উক্ত বইয়ের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে হান্টার বার বার ওহাবী আলেম-ওলামা, ছাদেকপুরী পরিবার ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে ইংরেজ সরকারের শত্রু লিখেছেন, তাদের কর্মতৎপরতা খুব করে তুলে ধরেছেন, ইংরেজ সৈনিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষের বর্ণনা দিয়েছেন, এ পথে তাদের উপর আপতিত বিপদাপদ, কষ্ট-ক্লেশ ও মামলা-মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করে তাদের অতুলনীয় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ঐ ইংরেজ পর্যবেক্ষক কোথাও দেওবন্দের মুরব্বীদের নাম উল্লেখ করেননি। যদি দেওবন্দের মুরব্বীগণ কোন এক পর্যায়েও ইংরেজদের বিরোধিতা করতেন এবং জিহাদ আন্দোলনে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন তাহ'লে তাদের কর্মকাণ্ড হান্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের আলোচনা থেকে তার বই শূন্য থাকা সম্ভব ছিল না।

'ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী'[১৬] বইয়ের প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ তার বইয়ে যদিও শামেলীর ঘটনা বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন এবং এ ঘটনাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনের অংশ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন তবুও তিনি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'এক্ষেত্রে ইতিহাসের একজন ছাত্র যখন দেখতে পায় ইতিহাসের পাতাগুলিতে মালাগড়, ফরখনগরের মতো অখ্যাত স্থানের নাম আছে কিন্তু এই এলাকা (অর্থাৎ মুযাফ্ফর নগর ও সাহারানপুর যেলা, যেখানে দেওবন্দ অবস্থিত) এবং এখানকার মুজাহিদদের কোন আলোচনা নেই তখন তার হয়রানী-পেরেশানির অন্ত থাকে না'।[১৭]

এটা সেই সত্য, যার প্রকাশ হঠাৎ করেই তাদের কলমের ডগায় এসে গেছে। নয়তো তারা এ এলাকাকে জিহাদ আন্দোলনে শামিল করতে যে বিস্তারিত বিবরণ হাযির করেছেন এ স্বীকারোক্তির পর তা সবই বানোয়াট ও মনগড়া ইতিহাস বৈ আর কি হ'তে পারে? মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী যাকে 'কল্পনা বিলাস' বলে অভিহিত করেছেন।

[ক্রমশঃ]

---

১৫. *প্রফেসর আইয়ূব ক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান নানূতুভী, পৃ. ১১৭।*

১৬. *'উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য' শিরোনামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ৪ খণ্ডে এ বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। -সম্পাদক।*

১৭. *ওলামায়ে হিন্দ কী শানদার মাযী, ৪/২৪৯ পৃ., লাহোর।*

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ঈদে মীলাদুন্নবী : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

রবীউল আউয়াল আরবী বারটি মাসের তৃতীয় মাস। এই মাস মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুর মাস। এ মাসে শরী'আত কর্তৃক কোন বিশেষ ইবাদত ও অনুষ্ঠান না থাকলেও অনেক মুসলমান বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ইবাদত পালন করে থাকেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ উল্লেখ করার সাথে সাথে এ মাসের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ও নবুঅতের পূর্বাভাস :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) শেষনবী ও রাসূল হিসাবে শেষ যামানায় আসবেন সেটা মহান আল্লাহ তা'আলা অনেক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قالوا يا رسولَ اللهِ! مَتَى وجَبت لكَ النُّبوَّةُ؟ قال: وآدمُ بين الرُّوحِ والجسَدِ، 'লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নবুঅত কখন অবধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, যখন আদম (আঃ) তাঁর শরীর ও রূহের মধ্যে ছিল'।[১] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীদের কাছ থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হওয়ার আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ-

'আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত দান করেছি, এর পরে যখন তোমাদের কাছে সেই রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাবের সত্যায়ন করবেন, তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি এতে স্বীকৃতি দিচ্ছ এবং তোমাদের স্বীকৃতির উপর আমার অঙ্গীকার নিচ্ছ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে অন্যতম সাক্ষী রইলাম' *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ এমন কোন রাসূল প্রেরণ করেননি যার কাছ থেকে এই শপথ গ্রহণ করেননি। তথা প্রত্যেক রাসূলের কাছে তিনি এই মর্মে শপথ নিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেন এবং সেই নবী বা রাসূল জীবিত থাকেন, তাহ'লে তারা যেন মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাকে সাহায্য করে। তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের উম্মতের কাছ থেকে এই বলে শপথ নেয় যে, যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয় এবং তারা জীবিত থাকে, তাহ'লে তারা যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে সহযোগিতা করে।[২]

ইবরাহীম (আঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবেন এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিচ্ছন্ন করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

ঈসা (আঃ)ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ-

'(স্মরণ কর,) যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটি প্রকাশ্য জাদু' *(ছাফ ৬১/৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، 'যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পেয়েছে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ১০ বা ১২ বছর বয়সে চাচা আবূ ত্বালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার বুছরা শহরে পৌঁছলে সেখানে খ্রিষ্টান পাদ্রী জিরজিস ওরফে বাহীরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবী হওয়ার সুসংবাদ দেন।[৩]

---

* সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলক্ষেত, ঢাকা।

১. তিরমিযী হা/৩৬০৯; ছহীহাহ হা/১৮৫৬; মিশকাত হা/৫৭৫৮।

২. ইবনে কাছীর, সূরা আলে ইমরান ৮১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৩. তিরমিযী হা/৫৯১৮; মিশকাত হা/৫৯১৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবীউল আউয়াল[৪] সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু'টিই সোমবারে হয়েছিল'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আমুল ফীল' বা হস্তী বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন।[৬] এ মর্মে একটি হাদীছে এসেছে, ক্বায়েস ইবনু মাখরামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمُرَ بْنِ لَيْثٍ أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلاَدِ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيلِ،

'আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তী বছরে (আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের বছর) জন্মগ্রহণ করি। তিনি বলেন, ইয়াসার ইবনু লাইছ গোত্রীয় কুবাছ ইবনু আশইয়ামকে ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) প্রশ্ন করেন, আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার চাইতে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতীর বছর জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার মা আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে গিয়ে আমি পাখিগুলির (হাতিগুলির) মলের রং সবুজে বদল হয়ে যেতে দেখেছি।[৭] 'আমুল ফীল' বা হাতীর বছর কত খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল তার দু'টি মত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবার কারো কারো মতে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে।[৮]

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ইংরেজী পঞ্জিকা মতে, তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর।[৯]

আমাদের সমাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ প্রসিদ্ধ থাকলেও ৯ই রবীউল আউয়াল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস বলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি ৯ই রবীউল আউয়াল ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।[১০] এই মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আর এই মতের পক্ষে আল্লামা হুমাইদী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু কাছীর, ইবনু হাজার আসক্বালানী, বদরুদ্দীন আইনীসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ রয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর সঠিক জন্ম তারিখ অকাট্যভাবে জানা যায়নি। রাসূল (ছাঃ) রবীউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন, রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখ নয়।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সোমবার দিনে ছিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি অথবা ঐ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) 'অহী' অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[১২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وُلِدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين واستُنْبِئَ يومَ الاثنين وتوفِّيَ يومَ الاثنين وخرج مهاجرًا من مكةَ إلى المدينةِ يومَ الاثنين وقَدِمَ المدينةَ يومَ الاثنين ورُفِعَ الحجرُ الأسودُ يومَ الاثنين-

'নবী করীম (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন সোমবার, নবুওয়াত লাভ করেন সোমবার, মৃত্যুবরণ করেন সোমবার, হিজরতের জন্য মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন সোমবার, মদীনায় আগমন করেন সোমবার, হাজারে আসওয়াদকে উত্তোলন করেন সোমবার'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু :

রাসূল (ছাঃ) কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেঈ ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে। ১লা রবীউল আউয়াল,[১৪] ২রা রবীউল আউয়াল, ১২ই রবীউল আউয়াল ও ১৩ই রবীউল আউয়াল।[১৫]

---

৪. *সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী, (মৃ. ১৯৩০ খ্রিঃ) রহমাতুল্লিল 'আলামীন (উর্দু), দিল্লী : ১৯৮০ খ্রিঃ ১/৪০; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৪, গৃহীত: সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৫৬।*

৫. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫; বুখারী হা/১৩৮৭।*

৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৭৪।*

৭. *তিরমিযী হা/৩৬১৯; ছহীহাহ হা/৩১৫২।*

৮. *আকরাম যিয়া আল-উমরী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-ছহীহা ১/৯৬-৯৮; মাহদী রেজাকুল্লাহ আহমাদ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১০-১১০ পৃ.। গৃহীত : ইয়াউস সুনান, পৃ. ৫৫৫।*

৯. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১।*

১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৫৬।*

১১. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, (ঈমান পর্ব) প্রশ্ন নং ৮৯।*

১২. *মুসলিম (ই.ফা) হা/২৮০৪, (ই.সে) হা/২৬১৩।*

১৩. *আহমাদ হা/৩৫০৬, আহমাদ শাকের এর সনদকে ছহীহ বলেছেন। আহমাদ ৪/১৭২; ত্বাবারানী ১২/২৩৭ হা/১২৯৮৪।*

১৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, সীরাতুল রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৫৬।*

১৫. *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১২৯; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা পৃ. ১২৫-১২৬।*

অধিকাংশ জীবনীকারের মতে দিনটি ছিল ১১ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন। তবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু'টিই সোমবারে হয়েছিল।[১৬] অতএব সেটা ঠিক রাখতে হ'লে তাঁর জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। আর তিনি ১১ হিজরী সনের ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার সকাল ১০-টার দিকে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু দিবস প্রকাশ না করার কারণ :

মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলে দিতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইচ্ছা করলে তাঁর জন্ম তারিখ জেনে নিতে পারতেন। ছাহাবীগণও ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু তারিখ লিখে রাখতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানাননি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেননি এবং ছাহাবীগণও স্মরণে রাখেননি। তার কয়েকটি কারণে হ'তে পারে-

এক- এর মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ জানেন।

দুই- ইসলামের দৃষ্টিতে কারো জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনে কোন কল্যাণ নেই। যদি কল্যাণ থাকত তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের, তাঁর পিতা-মাতা অথবা দাদা-নানার জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করতেন।

তিন- মহান আল্লাহ যদি জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের বিধান রাখতেন, তাহ'লে সারা বছর মানুষকে শুধু জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করতে হ'ত। এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল,[১৮] এক লক্ষ চব্বিশ হাযার ছাহাবী,[১৯] অসংখ্য ইমাম, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করলে প্রতিদিন অসংখ্য জন্ম-মৃত্যু দিবস হ'ত তখন কার জন্ম-মৃত্যু দিবস রেখে কারটা পালন করত মানুষ?

চার- জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করা বিধর্মীদের রীতি। তাই এ সকল ক্ষেত্রে বিধর্মীদের বিরোধিতা করাই ইসলামের নির্দেশ।

পাঁচ- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য, তাঁর জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করে অনুষ্ঠান সর্বস্ব হওয়ার জন্য নয়।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মদিন উপলক্ষে সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ড :

(১) মীলাদ পালন : 'মীলাদ' (ميلاد) অথবা মাওলিদ (مولد) আরবী শব্দ। যার অর্থ-জন্ম, জন্মকাল, জন্ম তারিখ। আর 'মীলাদুন্নবী' অর্থ- নবীর জন্ম দিন বা নবীর জন্ম সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস মনে করে ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখ তাঁর জন্মের বা জীবনের কিছু বিবরণ, ওয়ায-নছীহত, তাঁর প্রতি কিছু দরূদ পাঠের মাধ্যমে মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। বর্তমানে মীলাদের এমন প্রসার পেয়েছে যে, মুসলিমগণ শুধু একদিন মীলাদ পালন করে ক্ষান্ত হয়নি বরং বছরের প্রতিটি দিন যে কোন অনুষ্ঠানে মীলাদ পালন করে থাকে। ঘর উদ্বোধন, দোকান উদ্বোধন, পিতা-মাতার জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন, ছেলে-মেয়েদের আক্বীক্বা, সুন্নাতে খাতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আগে-পরে মীলাদের আয়োজন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মদিন নিঃসন্দেহে মুসলিমদের জন্য একটি আনন্দের দিন। কিন্তু এই জন্মদিন রাসূল (ছাঃ) নিজে পালন করেননি, তাঁর ছাহাবীগণ, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, করেননি; প্রসিদ্ধ চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) পালন করেননি এবং এসব পালন করতে বলে যাননি। তাই এই দিনে কোন অনুষ্ঠান করা, অতিরিক্ত কোন ইবাদত চালু করা, ছওয়াবের আশায় ধর্মের মধ্যে অতিরঞ্জন করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد، 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২০]

মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'শরী'আতের দিক থেকে যদি মীলাদ মাহফিল উদযাপন করা সঠিক হ'ত, তবে নবী করীম (ছাঃ) তা করতেন অথবা তাঁর উম্মতকে করতে বলতেন। আর পবিত্র কুরআন বা হাদীছে অবশ্যই তা সংরক্ষিত থাকত'।[২১]

(২) ঈদে মীলাদুন্নবী পালন : এক শ্রেণীর মুসলিম শুধু মীলাদুন্নবী পালন করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা এই দিনটিকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। তারা ইসলামের দু'টি ঈদের সাথে এ দিনটিকে তৃতীয় আরেকটি ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং তারা বলে থাকে, সকল ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদুন্নবী। আর ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা উম্মতের উপর ফরয ইত্যাদি। অথচ ইসলামে অনুমোদিত ঈদ কেবল দু'টি। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

১৬. *মুসলিম হা/১১৬২; বুখারী হা/১৩৮৭।*
১৭. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুল রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭৪৩।*
১৮. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*
১৯. *মির'আত শরহ মিশকাত, হা/২৫৬৯ এর ব্যাখ্যা দ্র.।*
২০. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; আবূদাঊদ ৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪।*
২১. *মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, (ঈমান পর্ব) প্রশ্ন নং ৮৯।*

'রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখলেন বছরের দু'টি দিনে মদীনাবাসীরা আনন্দ-ফূর্তি করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দিন দু'টি কি? তারা বলল যে, আমরা ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে এ দু'দিন আনন্দ-ফূর্তি করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দু'টি দিন তোমাদের দিয়েছেন। তা হ'ল ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।[২২]

(৩) ক্বিয়াম করা : ক্বিয়াম (قيام) আরবী শব্দ। অর্থ- দণ্ডায়মান হওয়া, দাঁড়ানো অবস্থা ইত্যাদি। মীলাদে কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার ও বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাযির হয়েছেন মনে করে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে ক্বিয়াম বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মীলাদ অনুষ্ঠানে হাযির হন এই বিশ্বাস নিয়ে ক্বিয়াম করা হারাম ও শিরকী কাজ। কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ হাযির-নাযির নন এবং তিনি ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর রাখেন না *(আন'আম ৬/৫০; নমল ২৭/৬৫; লোক্বমান ৩১/৩৪)*। আর মৃত্যুর পর কোন রূহ দুনিয়াতে ফিরে আসা সম্ভব নয় *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন *(যুমার ৩৯/৩১; আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। সুতরাং তাঁর অথবা তাঁর আত্মার পৃথিবীর কোন মীলাদ-মাহফিল বা ক্বিয়াম অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত অবস্থায়ও ছাহাবীদের এমন কর্ম অপসন্দ করেছেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন তার সম্মানার্থে তারা দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না'।[২৩] মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'যার মনের অভিলাষ এই যে, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির মতো দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়'।[২৪]

(৪) বিধর্মীদের অনুসরণে জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন : জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন ইসলামের রীতি নয়; বরং বিধর্মীদের রীতি। তারা তাদের ধর্মের প্রধান ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন করে থাকে। হিন্দুধর্মের অনুসারীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস উপলক্ষে জন্মাষ্টমী পালন করে থাকে। হিন্দু পঞ্জিকা মতে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তা পালন করা হয়।[২৫] ঈসা (আঃ)-এর জন্ম কখন হয়েছে, তা জানা না থাকলেও খৃষ্টানরা যীশুর জন্মদিবস হিসাবে ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিন পালন করে থাকে।[২৬] আর মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের লোকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জায়েয নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'।[২৭]

বর্তমানে মানুষ শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস পালনে থেমে নেই; বরং নিজেদের জন্মদিন, ছেলে-মেয়েদের জন্মদিন, পিতা-মাতার জন্ম-মৃত্যু দিন, এমনকি নেতা-নেত্রীর জন্ম-মৃত্যু দিবসও পালন করে থাকে। যার কোনটিই জায়েয নয়।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা : মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে, তাঁর সম্মানে অতিরঞ্জিত করা হয়। অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয় (নাঊযুবিল্লাহ)। মীলাদে পঠিতব্য অতি পরিচিত একটি উর্দূ কবিতার একটি অংশ এরূপ, 'ওহ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর্, উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছতফা হো কর্'। অর্থ-'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, তিনিই মদীনায় নেমে এলেন মুছতফা রূপে'।[২৮]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে নূরে মুহাম্মাদী অর্থাৎ তিনি নূরের তৈরি, তাঁকে সৃষ্টি না করা হ'লে আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হ'ত না, তাঁর নূরে আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম, আসমান-যমীন সৃষ্টি হয়েছে, আদম (আঃ) তার নামের অসীলায় ক্ষমা পেয়েছেন, মে'রাজে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতাসহ আরশে উঠিয়ে আরশের গৌরব বৃদ্ধি করেন ইত্যাদি মিথ্যা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি কথা বলে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عبدُ الله ورسولُه 'খ্রিস্টানরা মারইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা (আ.)-এর প্রশংসায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল বল'।[২৯] এমনকি তাঁর নামে মিথ্যা বলাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়'।[৩০]

---

২২. *আবূদাঊদ হা/১১৩৪; নাসাঈ হা/১৫৫৬; আহমাদ হা/১২০০৬।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৭৫৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৪৬; আহমাদ, হা/১২৩৭০; ছহীহাহ হা/৩৫৮।*
২৪. *আবূদাঊদ হা/৫২২৯; তিরমিযী হা/২৭৫৫; ছহীহাহ হা/৩৫৭।*
২৫. *https://bn.wikipedia.org/wiki/ জন্মাষ্টমী।*
২৬. *https://bn.wikipedia.org/wiki/ বড়দিন।*
২৭. *আবূদাঊদ, হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯।*
২৮. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ১৮।*
২৯. *বুখারী হা/৩৪৪৫, ৬৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৩৩১৯; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*
৩০. *বুখারী হা/১০৯।*

(৬) মিথ্যা দরূদ বানানো : সমাজে বহুল প্রচলিত, মীলাদের সময় পঠিত একটি প্রচলিত দরূদ (?) হ'ল- بلغ العلى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، 'তিনি (মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর পরিপূর্ণতার দ্বারা উচ্চ আসনে পৌঁছেছেন। তাঁর সৌন্দর্যের কারণে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর সমস্ত স্বভাব-চরিত্র সুন্দর। তোমরা তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ পাঠ কর'।

সমাজে প্রচলিত উক্ত বাক্যগুলো আসলে কোন দরূদ নয়, বরং এটি পারস্য কবি শেখ সা'দী (৫৮৫ বা ৬০৬-৬৯১ হিঃ)-এর গ্রন্থের একটি কবিতার অংশ। তিনি রাসূলের প্রশংসায় এটি রচনা করেছেন।

এই কবিতায় শিরকের মিশ্রণ রয়েছে। কারণ এখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) নিজের পরিপূর্ণতা দ্বারা উচ্চ আসনে পৌঁছেন। আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজের যোগ্যতার দ্বারা উচ্চ আসনে পৌঁছেননি, বরং আল্লাহ তাঁকে উচ্চ আসনে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 'আর আমরা তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি' *(ইনশিরাহ, ৯৪/০৪)*। সুতরাং দুনিয়ায় ও আখেরাতে রাসূল (ছাঃ)-এর যত সম্মান, যত মর্যাদা সব তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল নিজের যোগ্যতায় এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তাহ'লে তিনি আল্লাহ্‌র ক্ষমতার সাথে শিরক করবেন।

এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সালাম জানাতে ও দরূদ পাঠ করতে বলা হয় যে, يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. 'হে নবী! আপনার প্রতি সালাম। হে রাসূল! আপনার প্রতি সালাম। হে হাবীব! আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার উপর রহমত'।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত কথাগুলি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত কোন দরূদ নয়। বরং এগুলি মানুষের বানানো দরূদের নামে জালিয়াতি।

আর এসব আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ীও ভুল। কারণ সম্মানিত কাউকে ডাকার জন্য সম্মান দিয়ে ডাকতে হয়। অথচ এখানে সমস্ত নবীদের সর্দার, দুনিয়া-আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাকে অনির্দিষ্ট বাক্যে ডাকা হয়েছে যা আদবের খেলাপ।

আর আল্লাহ কুরআনের যত জায়গায় রাসূলকে সম্বোধন করেছেন সেখানে يا ايها الرسول বা يا رسول না বলে يا نبي বা يا ايها النبي বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، 'হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তাদের জন্যও' *(আনফাল ৮/৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও' *(মায়েদা ৫/৬৭)*।

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের জন্য, ছওয়াবের আশায় দরূদ পাঠ করতে হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই করতে হবে। অন্যথা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞার করণে ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু দিবস উপলক্ষে করণীয় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বিশেষ কোন আমলের বর্ণনা শরী'আতে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কোন আমল করেননি, তাঁর লক্ষাধিক ছাহাবা কিছু করেননি, খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ কিছু করেননি, এমনকি তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ কিছু করেননি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত কোন ইবাদত করা, অনুষ্ঠান করা জায়েয নয়। বরং প্রতিদিন যেসকল ইবাদত পালন করা হয়, ঐ দিনও তাই পালন করতে হবে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহব্বত করা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁর পরিপূর্ণ ইত্তেবা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

পরিশেষে বলব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস পালন নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে তাঁকে অনুসরণই কাম্য। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

ঈদে মীলাদুন্নবী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা : ‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম ‘আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-র দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি : ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[১] পরে অন্যান্য আলেমরাও একই পথ ধরেন কিছু সংখ্যক বাদে।

হুকুম : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[৫]

মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত : ‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।[৬]

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম : মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন *(মীলাদুন্নবী ৩২-৩৩ পৃ.)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার তাঁর মৃত্যুদিবস।[৭] অথচ ১২ই রবীউল আউয়াল তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই : মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ‘আত হ’লেও তা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায শুনানো যায়। অথচ ওয়াযের নামে সব ভিত্তিহীন কাহিনী শুনানো হয় ও সুরেলা কণ্ঠে সমস্বরে দরূদের নামে আরবী-ফারসী-উর্দূ-বাংলায় গান গাওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল বিদ‘আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন তা পানযোগ্য থাকে না, তেমনি বিদ‘আতী অনুষ্ঠানের কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। তাছাড়া বিদ‘আতকে ভাল ও মন্দ দু’ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ‘আত।

ক্বিয়াম প্রথা : সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৮] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।[৯]

এদেশে দু’ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামী, অন্যটি বে-ক্বিয়ামী। ক্বিয়ামীদের যুক্তি হ’ল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ‘সম্মানে’ উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে

---

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃ. ১৩/১৩৭।*
২. *মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫।*
৪. *নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘কিভাবে খুৎবা দিবে’ অনুচ্ছেদ।*
৫. *আবুবকর আল-জাযায়েরী, (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।*
৬. *মীলাদুন্নবী ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম (১ম সংস্করণ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১ পৃ.।*
৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.।*
৮. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), ১৭ পৃ.।*
৯. *তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ’তে ফটোকৃত) ৬/১৭৪।*

কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, জেনে রাখ, সে ব্যক্তি কুফরী করল'।[১০] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[১১] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? আর একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।[১২]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম, আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে'।[১৩]

(৪) আদম (আঃ) ভুল স্বীকার করার পরে মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। তাকে বলা হ'ল তুমি এ নাম কিভাবে জানলে? তিনি বললেন, আমি উপরে তাকিয়ে দেখি আপনার আরশের খুঁটিতে ঐ নামটি সহ লেখা আছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাই আমি তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহ বললেন, কথা তুমি সত্য বলেছ। তার দোহাই দিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১৪]

(৫) আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাযার বছর পূর্বে জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আলী মুহাম্মাদের ভাই'।[১৫]

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর আরশে বসবেন'।[১৬]

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যেকার দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে আবু লাহাবের জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[১৭]

এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, (ক) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(খ) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(গ) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট।

মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[১৮]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১৯]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। এগুলির বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

১০. মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, (মউ, ইউ পি ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃ.।
১১. তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবূদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদব' অধ্যায়।
১২. দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।
১৩. আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭, সনদ বিহীন।
১৪. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫।*
১৫. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯০১।*
১৬. *সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ৮৬ পৃ.।*
১৭. সবই ভিত্তিহীন। দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃ.।
১৮. বুখারী হা/১০৭; মিশকাত হা/১৯৮।
১৯. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।

ছিয়ামের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ছিয়াম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের অতুলনীয় একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়ামকে ফরয করেছেন। পাশাপাশি বছরের অন্যান্য মাসগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের নফল ছিয়াম বিধিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে মাসিক, সাপ্তাহিক ও বিশেষ দিনের ছিয়াম। জান্নাত পিয়াসী বান্দাগণ এসব ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিল করতে পারে। সেই সাথে আল্লাহ বান্দাদের এমন কিছু বিশেষ আমলের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা সম্পাদনের মাধ্যমে ছিয়াম পালন না করেও ছিয়ামের ন্যায় ফযীলত লাভ করা যায়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. বিবাদ মীমাংসা করা :

মুসলিম সমাজের কোথাও সম্পর্কের অবনতি ঘটলে যার যার জায়গা থেকে এগিয়ে এসে এই বন্ধন অটুট রাখা এবং বিবাদ মীমাংসায় কল্যাণময় ভূমিকা রাখা ঈমানের দাবী। কেননা ইসলাম মুসলমানদের বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ– 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، 'আর মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার মাধ্যমে একজন বান্দা একই সাথে ছিয়াম, ক্বিয়াম ও দান-ছাদাক্বার নেকী লাভ করতে পারে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، وَقَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، 'আমি কি তোমাদেরকে ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম আমলের ব্যাপারে অবহিত করব না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হ'ল মুণ্ডনকারী। তিনি বলেন, এটা মুণ্ডনকারী বলতে আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয় (বিনাশ করে)'।[১] আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, এই হাদীছে 'ফাসাদ দ্বীনকে বিনষ্ট করে' বলার মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিবাদ মীমাংসা করাকে মর্যাদার দিক দিয়ে ছিয়াম, ক্বিয়াম ও ছাদাক্বার চেয়েও উত্তম আমল গণ্য করা হয়েছে'।[২]

২. মিসকীন ও বিধবা মহিলাকে সহযোগিতা করা :

সহায়-সম্বলহীন ইয়াতীম, মিসকীন ও অসহায় বিধবা মহিলাদের সহযোগিতার মাধ্যমে একজন মুসলিম ছিয়াম পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায় অথবা আল্লাহ্র পথে সংগ্রামরত মুজাহিদের মত মর্যাদা লাভ করতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، 'বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ অথবা সারাদিন ছিয়াম পালনকারী ও রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াবের অধিকারী'।[৩] অপর বর্ণনায় এসেছে, كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، '(তার মর্যাদা হ'ল) সেই তাহাজ্জুদগুযারের মত, যে কখনো অলস হয় না এবং সেই ছিয়াম পালনকারীর মত, যে কখনো ছিয়াম ভাঙ্গে না'।[৪] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, বিধবা ও ইয়াতীম-মিসকীনকে সহযোগিতা করার অর্থ হ'ল তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, তাদের উপকার করা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো দেখভাল করা'।[৫]

৩. সচ্চরিত্রবান হওয়া :

সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিরা তাদের সদাচরণের মাধ্যমে ছায়েম ও তাহাজ্জুদগুযারের মর্যাদা লাভ করতে পারে। মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ، 'নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা তার সদাচরণের মাধ্যমে রাতে ক্বিয়ামকারী এবং দিনে ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করে থাকে'।[৬] শুধু তাই নয় ক্বিয়ামতের দিন মীযানে (পাল্লাতে) সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে সদাচরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، 'মীযানে (পাল্লাতে) যা কিছু রাখা হবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে সচ্চরিত্র। একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সদাচারের মাধ্যমে (নফল) ছিয়াম পালনকারী ও রাতের

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *তিরমিযী হা/২৫০৯; আবূদাঊদ হা/৪৯১৯; মিশকাত হা/৫০৩৮, সনদ ছহীহ।*

২. *আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু সুনান আবীদাঊদ ২৮/২০৩।*

৩. *তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০, সনদ ছহীহ।*

৪. *বুখারী হা/৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২।*

৫. *উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৩/১০০।*

৬. *আবূদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/ ৫০৮২, সনদ ছহীহ।*

(নফল) ছালাত আদায়কারীর মর্যাদায় উপনীত হয়'।[৭] হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, মানুষের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তিনটি উপায়ে সচ্চরিত্রবান হওয়া যায়। (১) উপকার ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের কষ্ট দূর করা (২) শ্রম ও অর্থের মাধ্যমে দানশীল হওয়া এবং (৩) হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে কথা বলা'।[৮]

৪. পানাহারের পর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা :

আল্লাহ্র প্রতিটি অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অন্যতম বড় নে'মত হ'ল খানাপিনা। মহান আল্লাহ খানাপিনার ব্যাপারে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। আল্লাহ্র এই নির্দেশকে মান্য করে যারা খানাপিনার পরে শুকরিয়া আদায় করে, তিনি তাদেরকে ছায়েমের মর্যাদা দান করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ، 'কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল ছিয়াম পালনকারীর সমান মর্যাদাশীল'।[৯] ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, هَذَا مِنْ تَفَضُّلِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ جَعَلَ لِلطَّاعِمِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ، 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম অনুগ্রহ হ'ল তিনি আহারকারীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, সে যদি নে'মতপ্রাপ্ত হয়ে স্বীয় রবের শুকরিয়া আদায় করে, তাহ'লে ধৈর্যশীল ছায়েমের নেকী লাভ করতে পারবে'।[১০] উল্লেখ্য যে, শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হ'ল হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্র নে'মতকে উপলব্ধি করা, যবান দিয়ে এর প্রশংসা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নে'মতদাতার আনুগত্য করা। সুতরাং শুধু মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলাই কেবল শুকরিয়া নয়; বরং তা শুকরিয়া আদায়ের একটি অংশ মাত্র।[১১]

৫. জুম'আর দিনের আদব রক্ষা করা :

জুম'আ মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। জুম'আর দিনের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তন্মধ্যে পাঁচটি আমল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، '(১) যে ব্যক্তি জুম'আর দিন অন্যকে গোসল করাল এবং নিজে গোসল করল। (২) (মসজিদে) আগে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিল এবং নিজেও আগেভাগে মসজিদে গেল। (৩) পায়ে হেঁটে গেল এবং কোন কিছুতে (যানবাহনে) আরোহণ করল না। (৪) অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করল এবং (৫) কোন অনর্থক কাজ করল না। তাহ'লে তার জন্য প্রতি কদমে এক বছরের (নফল) ছিয়াম ও (রাত্রিকালীন) ক্বিয়ামের নেকী রয়েছে'।[১২] সিন্ধী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল- সেই ব্যক্তি তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছর নিয়মিত ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ আদায়ের মর্যাদা লাভ করবে'।[১৩] সুতরাং কারো বাড়ী থেকে মসজিদে যাওয়ার জন্য যদি ১০০ কদম হাঁটতে হয়, আর সে যদি জুম'আর দিনের উল্লেখিত পাঁচটি আদব রক্ষা করতে পারে, তাহ'লে তার আমলনামায় ১০০ বছরের নফল ছিয়াম ও রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে।

৬. মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্ত পাহারা দেওয়া :

আল্লাহ্র পথে পাহারা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে বান্দা অশেষ নেকী হাছিল করার পাশাপাশি ছিয়াম পালন করার নেকী লাভ করে। সালমান ফারেসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفُتَّانَ، 'আল্লাহ্র পথে একদিন ও এক রাত সীমান্ত পাহারা দেওয়া একমাস ছিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাহ'লে তার আমলের ছওয়াব জারী থাকবে, তার জন্য (শহীদদের মত) রিযিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে (কবরের) ফেৎনা সমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে'।[১৪] অর্থাৎ একদিন-একরাত সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মাধ্যমে টানা একমাস তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়াম পালন করার নেকী পাওয়া যায়।

৭. সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করা :

সকল ইবাদতের মূল উৎস হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। তাক্বওয়া ব্যতীত কোন ইবাদত একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، 'মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা,

৭. *তিরমিযী হা/২০০৩; আবূদাঊদ হা/ ৪৭৯৯, সনদ ছহীহ।*
৮. *ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ, ২/২১৬ পৃঃ।*
৯. *তিরমিযী হা/২৪৮৬; ইবনু মাজাহ হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৪২০৫, সনদ ছহীহ।*
১০. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৯/৫৮৩ পৃঃ।*
১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকিন ২/২৪৬ পৃঃ।*
১২. *আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০৫. সনদ ছহীহ।*
১৩. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৭২।*
১৪. *বুখারী হা/২৮৯২; মুসলিম হা/১৯১৩।*

তাঁর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হ'ল তাক্বওয়া'।[১৫] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) যখন জিহাদের জন্য কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন, তাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, لا تصوموا فإن التقوى على الجهاد أفضل من الصوم، 'তোমরা (জিহাদরত অবস্থায়) ছিয়াম রাখবে না। কেননা জিহাদে তাক্বওয়া অবলম্বন করা ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'।[১৬] অনুরূপভাবে সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহভীতির মাধ্যমে বান্দা ছায়েমের মর্যাদা পেতে পারে। যেমন আয়-রোযগারের ক্ষেত্রে হারাম বর্জন করে হালাল পন্থায় রোযগার করার চেষ্টা করা। হালাল উপার্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাযী আবূ ইয়া'লা মাওছীলী (রহঃ) বলেন, هُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّفَرُّغِ إِلَى طَلَبِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، 'এটা (আল্লাহ্র ভয়ে হালাল উপার্জন করা) ছিয়াম, ছালাত ও হজ্জের মত ইবাদত সম্পাদনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেয়ে উত্তম'।[১৭] এখানে ছিয়াম, ছালাত ও হজ্জের মাধ্যমে তিনি নফল ইবাদতকে বুঝিয়েছেন।

৮. জ্ঞান অর্জন করা ও তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা :

দ্বীনের বিধি-বিধান পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।[১৮] আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، 'অতএব তুমি জান যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে প্রতিটি ইবাদতের পূর্বে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাইতো মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেছেন, أَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ، وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ، يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، التَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ، وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ، بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، وَهُوَ إِمَامُ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لَهُ، 'জ্ঞান অন্তরগুলোকে মূর্খতা থেকে পুনর্জীবিত করে এবং আঁধার কাটিয়ে দূরদর্শিতার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। জ্ঞানের মাধ্যমেই বান্দা উত্তমদের স্তরে উপনীত হয় এবং দুনিয়া-আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইলম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছিয়াম সমতুল্য এবং তার পঠন-পাঠন ক্বিয়ামুল লায়লের মত। জ্ঞানের মাধ্যমেই আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায় এবং এর মাধ্যমেই হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। জ্ঞান হ'ল আমলের নেতা এবং আমল জ্ঞানের অনুগামী'।[১৯]

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয় জ্ঞানই দ্বীনের মূল স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ আলো। কখনো কখনো জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে বইয়ের পাতাগুলো উল্টানো নফল ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ এবং জিহাদ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। এমন কিছু মানুষ আছে, যে ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে নিজের ইবাদতে প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে থাকে। সে নফল ইবাদত করতে গিয়ে অনেক অকাট্য ফরয ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। স্পষ্ট ওয়াজিবকে ত্যাগ করে তার ধারণাপ্রসূত উত্তম (?) কাজ করে। (অথচ শরী'আতে সেটা উত্তম কাজ নয়)। হায়! যদি তার নিকটে সঠিক জ্ঞানের একটি আলোকবর্তিকা থাকত, তাহ'লে অবশ্যই সে সঠিক পথ পেত'।[২০]

৯. ছায়েমদের খেদমত করা :

ছিয়ামের ন্যায় নেকী লাভ করার অন্যতম একটি উপায় হ'ল ছায়েমদের খেদমত করা। আনাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ 'আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ ছিয়াম পালন করেছেন, আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদর বিশিষ্ট লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হ'ল। আমাদের কেউ কেউ নিজ হাত দ্বারা সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। অবশেষে ছায়েমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং ছিয়াম ত্যাগকারীরা সুস্থ থাকল। ফলে তারা তাঁবু খাটালো এবং উটকে পানি পান করাল, [কিন্তু ছায়েমরা কোন কাজ করল না *(বুখারী)*] তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ، 'আজকে তো ছিয়াম পরিত্যাগকারীরা সব নেকী অর্জন করে নিল'।[২১] মূলত ছায়েমদের খেদমত করার কারণে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলেছেন। যার মর্ম হ'ল খেদমতকারীরা একই সাথে সেবা করার এবং ছিয়াম পালন করার ছওয়াব হাছিল করল।[২২]

১০. ছায়েমদের ইফতার করানো :

ছিয়াম না রেখেও ছিয়ামের মর্যাদা হাছিলের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হ'ল ছায়েমদের ইফতার করানো। যায়েদ ইবনু খালিদ আল-

১৫. *শানক্বীত্বী, লাওয়ামি'উদ দুরার, পৃঃ ১১০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, পৃ. ৪২১।*
১৬. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃঃ ১২৫।*
১৭. *আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ ৩/২৬৭।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৭২; মিশকাত হা/২১৮, সনদ ছহীহ।*
১৯. *মাদরিজুস সালেকীন ৩/২৪৬ পৃঃ ।*
২০. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ১১৩।*
২১. *বুখারী হা/২৮৯০; মুসলিম হা/১১১৯।*
২২. *ফাৎহুল বারী ৪/১৮৪।*

জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করায়, সেই ব্যক্তির জন্যেও ছায়েমের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে ছায়েমের নেকী থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না'।[২৩]

উপসংহার :

নেক আমল আমাদের মূল সম্বল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের মূল পাথেয়। যে ব্যক্তি যত বেশী পাথেয় সঞ্চয় করবে, তার আখেরাতের জীবন তত বেশী সমৃদ্ধ হবে। আর যে পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে গাফেল থাকবে, তার আখেরাত হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই বুদ্ধিমান মুমিনের কর্তব্য হ'ল- ছওয়াব অর্জনের সুযোগগুলো কখনো হাতছাড়া না করা এবং সাধ্যানুযায়ী নেক আমলের চেষ্টা করা। আর কোন আমলের দ্বিগুণ নেকী পাওয়ার অন্যতম উপায় হ'ল অন্যকে সেই আমলের দাওয়াত দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، 'যে ব্যক্তি অন্য কোন মানুষকে কোন নেক কাজের পথ দেখায়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান ছওয়াব পায়'।[২৪] সুতরাং কেউ যদি উল্লেখিত আমলগুলোর দাওয়াত অন্যদেরকে দেয় এবং তারা যদি সেই আমলগুলো করে, তাহ'লে শিক্ষাদানকারীও সমান ছওয়াব লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত আমলগুলো সম্পাদন করে ছিয়ামের নেকী লাভের সুযোগ দান করুন এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৩. *তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬, সনদ ছহীহ।*

২৪. *মুসলিম হা/১৮৯৩; আবূদাঊদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬১৭; মিশকাত হা/২০৯।*

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা

*মূল (ইংরেজী): মুনীরুদ্দীন আহমাদ**

*অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব***

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিভূমি :

ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। সেসময় রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিকটে কুরআনী নির্দেশনা ব্যাখ্যা করতেন, যেন তারা দ্বীনের আলোয় আলোকিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর এসব মজলিসই পরবর্তী যুগে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মডেল হিসাবে কাজ করেছে। মসজিদে নববীতে নিয়মিত দ্বীনী মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত এবং এটা ইসলামের ইতিহাসে কেবল প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না, বরং পরবর্তীতে এটা রীতি হয়ে দাঁড়াল যে, মসজিদগুলি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। ফলে শত শত বছর ধরে যেসব স্থানকে ঘিরে শিক্ষা-কার্যক্রম আবর্তিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মসজিদই প্রথম স্থান দখল করে রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) যেরূপ মৌখিকভাবে ছাহাবীদের মাঝে দ্বীনের কথা ব্যাখ্যা করতেন, বা সহজ ভাষায় বললে যে পদ্ধতিতে ছাহাবীগণ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী আত্মস্থ করতেন, সেটাই পরবর্তীকালে ইলম চর্চার প্রধান মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হয়। যেমন ছাত্রদেরকে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী স্বয়ং শিক্ষকের মুখ থেকে শুনতে হ'ত। এভাবে 'শ্রবণনীতি' (সামা') আত্মপ্রকাশ করল, যার উপর ভর করে সকল ইলমী কার্যক্রম এগিয়ে চলল। স্পষ্ট করে বললে, শ্রবণনীতির দাবী হ'ল যদি কোন নারী বা পুরুষ কোন কথা সরাসরি শিক্ষকের নিকট থেকে না শুনে থাকে, তাহ'লে তা উক্ত শিক্ষকের বরাতে অন্যের নিকট প্রচার করা যাবে না।[১]

হাদীছ নিঃসন্দেহে দ্বীনী ইলমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল এবং এটাই শ্রবণনীতির (সামা') আত্মপ্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এটার মূল বক্তব্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে শ্রবণ করতে হবে। যেটা অনেকটা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর মজলিসে হাযির হওয়ার শামিল। প্রথম যুগে হাদীছের ছাত্ররা নিয়মিত ক্লাসে হাযির হয়ে হাদীছ 'শেখার' চেয়ে বিভিন্ন শায়খের নিকট থেকে হাদীছ 'সংগ্রহ করাকে' প্রাধান্য দিতেন। 'সংগ্রহের' বিষয়টি পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় হাদীছের মজলিসগুলি যতটা না ইলমী উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দ্বীনী প্রেরণায়। অবশ্য এরই মধ্য দিয়ে ইলমে হাদীছ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে।

ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষা-কার্যক্রম :

ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষা-কার্যক্রম সম্পর্কে, বিশেষ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। খুব সম্ভবত কুরআনের পঠন-পাঠনই ছিল সব ধরনের শিক্ষা উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সে সময় বহু মুসলিম কুরআন হিফয করতেন। সম্ভবত বহুল পরিচিত 'দারুল কুররা'ই হ'ল প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বদর যুদ্ধের পর মদীনায় হিজরতকালে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ও মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়।[২] এটাও জানা যায় যে, ছুফফাহ, যেটা হ'ল মসজিদে নববীর মধ্যে বারান্দা বিশেষ, তাহ'ল প্রকৃতপক্ষে প্রথম আনুষ্ঠানিক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে পঠন, লিখন, ফিক্বহ, তাজবীদসহ (কুরআন শুদ্ধরূপে পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি) অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের অধ্যয়ন চলত।[৩] ছুফ্ফাহ কোন সুবিন্যস্ত আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল কি-না, সে প্রশ্ন আপাতত মুলতবী রেখে, রাসূল (ছাঃ) যে তাদের পাঠন কার্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন, এই দাবী অন্তত বেশ জোরের সাথে করা যায়। ছালাত পরবর্তী হালাকা সমূহ, যেগুলি কম-বেশী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল, সেগুলি ছাড়াও ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-কে মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে ঈমান ও আখলাক সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করতেন।[৪]

আলোচনার সময় রাসূল (ছাঃ) তাঁর চারপাশে উপবিষ্ট শ্রোতাদেরকে একটি বিষয় তিন বার করে বলতেন।[৫] রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন গোত্রের নিকট কুরআনের প্রশিক্ষক পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে খলীফা ওমর (রাঃ)ও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।[৬] যাহোক, ইসলামী শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নকল্পে মদীনায় একটি বিশেষ মজলিস গঠিত

---

* *মুনীরুদ্দীন আহমাদ (মুনীর ডি আহমাদ) : (১৯৩৪-২০১৯) একজন পাকিস্তানী লেখক ও গবেষক। তিনি ১৯৩৪ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পড়ালেখা করেছেন। পরবর্তীতে জার্মানীর হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেন এবং এখান থেকে ১৯৬৭ সালে খত্বীব বাগদাদীর 'তারীখে বাগদাদ'-এর উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর উক্ত বিশ্বিবদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনাও করেন। ২০১৯ সালের ২১শে এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হ'ল, 'Muslim education prior to the establishment of Madrasah'। যা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামিক স্টাডিজ' পত্রিকায় ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।*

** *শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বিস্তারিত দেখুন: Gregor Schoeler, "Die Frage Der schriftlichen oder Mündlichen Überlieferung der Wissenschaften im frühen Islam;" Der Islam, Vol. LXII (1985). pp. 201-230.*

২. *তাকিউদ্দীন আহমাদ বিন আলী মাকরীযী, আল-মাওয়ায়েয ওয়াল ই'তিবার ফিয যিকরি ওয়াল আছার (কায়রো : ১২৭০ হিঃ/১৮৫৪ খ্রি.), ৬/১৯২; আব্দুর রহমান বিন আবুবকর জালালুদ্দীন সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারা ফী আখবারি মিছর ওয়াল কাহিরা (কায়রো : ১৩২৭ হিঃ/১৯০৯ খ্রি.), ২/১৪২।*

৩. *এম. হামীদুল্লাহ, 'এজুকেশনাল সিস্টেম ইন দ্যা টাইম অব দ্যা প্রফেট' ইসলামিক কালচার, হায়দ্রাবাদ, ১৩ই (জানুয়ারী ১৯৩৯, নং. ১. পৃ. ৫৪।*

৪. *বুখারী হা/৫৯, ৮৩, ৮৪, ৯০।*

৫. *বুখারী হা/৯৪-৯৫।*

৬. *বুখারী, ইলম অধ্যায়, ২৫ অনুচ্ছেদ।*

হয়েছিল বলে দাবী করা হয়।[৭] আরো বলা হয়, হাদীছ প্রচারের উদ্দেশ্যে আহলে ইলমের একটি দল গঠন করা হয়েছিল।[৮]

শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ :

মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের জীবন আবর্তিত হ'ত। কারণ মসজিদ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক তথা সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। ইবাদতগাহ হওয়া ছাড়াও মসজিদগুলি শত শত বছর ধরে সামাজিক পরিষদের ভূমিকাও পালন করে এসেছে। যেমন বিচারকরা (ক্বাযী) মসজিদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। কখনো কখনো মসজিদে মুসাফিরদের থাকার ব্যবস্থা করা হ'ত। আবু যাকারিয়া তাবরীযী দামেশকের জামে মসজিদের মিনার সংলগ্ন একটি ছোট্ট কক্ষে থাকতেন।[৯] মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মসজিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় মসজিদে নিয়মিত দরস অনুষ্ঠিত হ'ত। আর এভাবে মসজিদ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ত।

একথা সত্য যে, কেবলমাত্র মসজিদই শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না; বরং মসজিদ ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় পাঠদান সম্পন্ন হ'ত। পঠন-পাঠনের নিমিত্তে বিশেষ ভবন নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুবকর মুহাম্মাদ বিন বাশশার বছরী আল-বুনদার (মৃ. ২৫২ হিঃ) তার ছাত্র ইবনে খাররাশ (মৃ. ২৮৩ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনার নিমিত্তে একটি কক্ষ নির্মাণের জন্য ২০০০ দিরহাম গচ্ছিত রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কক্ষ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১০] আলী বিন মুহাম্মাদ আল-বাযযায (মৃ. ৩৩০ হিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, পড়াশোনার জন্য তার একটি বিশেষ গৃহ ছিল (বায়তুল ইলম)।[১১] এমনিভাবে আবু হাতেম বুসতী (জন্ম ২৭৭ হিঃ)-এর বিশেষ অবদান হ'ল, তিনি লাইব্রেরী সমৃদ্ধ একটি 'দারুল ইলম' গড়ে তোলেন এবং বহিরাগত ছাত্রদের জন্য বেশ কিছু কক্ষ নির্মাণ করেন। তিনি তাদেরকে নিজ উদ্যোগে ভাতাও দিতেন।[১২] নিশাপুরের প্রথমদিকের মাদ্রাসাগুলি শায়খদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩]

(১) বাসগৃহ :

অনেক সময় শিক্ষকদের নিজস্ব বাসভবন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবু মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন মিহরান আল-আ'মাশের (মৃ. ১৪৮ হিঃ) বাসভবন কূফার অন্যতম বিদ্যাপীঠ ছিল।[১৪] একজন দরিদ্র ছাত্রকে নিয়ে একটি মজার গল্প চালু আছে। ছাত্রটি টিউশন ফি দিতে না পারায় তার শিক্ষক ইবনে লুলূ (মৃ. ৩৭৭ হিঃ) তাকে দরস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। দরস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল শিক্ষকের গৃহে। নিরূপায় হয়ে ছেলেটি ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেও গৃহ সংলগ্ন একটি করিডোরে চুপচাপ বসে পড়ল। এবার যে ছাত্রটি উক্ত দরসে উস্তাযকে কিতাব পড়ে শোনাচ্ছিল, সে তার অসহায় বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইল। সে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগল যাতে করিডোরে বসা বন্ধুটিও শুনতে পায়।[১৫]

বাগদাদের একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল 'মজলিসে মাহামিলী'। এটি ২৭০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মূলতঃ ফিক্বহ ও ধর্মতত্ত্বের উপর আলোচনা হ'ত। মজলিসটি অনুষ্ঠিত হ'ত আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন ইসমাঈল যাব্বী মাহামিলীর বাসভবনে। প্রতি বুধবার এখানে সভা বসত এবং ৩৩০ হিজরীতে ক্বাযী মাহামিলীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনিই এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন।[১৬] শায়খদের কাছে বুধবার সম্ভবত পাঠদানের জন্য বিশেষ পসন্দের দিন ছিল।[১৭] হিজরী ৫ম শতকে বাগদাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিতর্কসভা ছিল ক্বাযী সিমনানীর (মৃ. ৪৪৪ হিঃ) বিতর্কসভা। এটি সিমনানীর গৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত।[১৮] বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল আব্বাস ছা'লাব (মৃ. ২৯১ হিঃ) বর্ণনা করেন, তিনি ৫০ বছর যাবৎ তার শিক্ষক ইবরাহীম হারবীর (মৃ. ২৮৫ হিঃ) গৃহে অভিধান-সংকলন বিদ্যার ক্লাসে হাযির হয়েছেন।[১৯] ব্যাকরণবিদ ফার্রা নিজ গৃহে পাঠদান করতেন।[২০] আবুবকর বিন সিরাজ নাহবী (মৃ. ৩১৬ হিঃ) সম্পর্কেও এমন কথা বর্ণিত আছে।[২১]

---

৭. *আবুল ফারাজ ইছফাহানী, কিতাবুল আগানী (কায়রো : ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৭ খ্রি.), ১/৪৮; ৪/১৬২-৩; সুয়ূত্বী. হুসনুল মুহাযারা, ১/১৩১।*

৮. *বুখারী, ইলম অধ্যায়, ২৫ অনুচ্ছেদ।*

৯. *বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন সা'দুল্লাহ বিন জামা'আহ. তাযকিরাতুস সা-মি' ওয়াল মুতাকাল্লিম ফী আদাবিল আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম (হায়দ্রাবাদ : ১৩৫৩হি./১৯৩৪খ্রি.), পৃ. ২১২।*

১০. *খত্বীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (কায়রো ও বাগদাদ : ১৩৪৯হি./ ১৯৩১খ্রি.), ৫/২৮১।*

১১. *প্রাগুক্ত, ১২/৭৪।*

১২. *Heinrich Ferdinand Wüstenfeld. Der Imam el-Schafi'i, seine Schüler und Anhänger bis zum Jahre 300 D.H., (Göttingen, 1890-91), p. 163.*

১৩. *Heinz Halm. "Die Anfänge der Madrasa," ZDM Supplement III, 1. XIX. Deutscher Orientalistentag vom 28. September bis 4. Oktober 1975 in Freiburg im Breisgau. 1977. p. 439.*

১৪. *তারীখু বাগদাদ, ৪/৩-১৩।*

১৫. *প্রাগুক্ত, ১২/৮৯-৯০; আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন জাওযী বাগদাদী, আল-মুনতাযাম ফি তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, (হায়দ্রাবাদ : ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রি.), ৭/১৪০।*

১৬. *তারীখু বাগদাদ, ৮/১৯-২৩।*

১৭. *আরো দেখুন, বুরহানুদ্দীন যারনূজী, তা'লীমুল মুতা'আল্লিম, তরীকাতুত তা'আল্লুম, 'ইনট্রোডাকশন টু স্টুডেন্ট : দি মেথডস অব লার্নিং'-শিরোনামে Gustav E. von Grunebaum Ges Theodora M. Abel কর্তৃক অনূদিত (নিউইয়র্ক : ১৯৪৭), পৃ. ৪৮।*

১৮. *তারীখু বাগদাদ, ১/৩৫৫।*

১৯. *প্রাগুক্ত, ৬/৩৩।*

২০. *প্রাগুক্ত, ১৪/১৫৩।*

২১. *প্রাগুক্ত, ৫/২১৯-২০।*

(২) দোকান :

যেহেতু অনেক শায়খ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তাদের দোকানগুলিতে মাঝে-মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন হ'ত। ইলমে ফারায়েযের একজন শিক্ষক সম্পর্কে শোনা যায়, তিনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নিজ দোকানে দরস প্রদান করতেন।[২২] খত্বীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হিঃ) ইবনে ইসহাকের দোকানে জনৈক শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেছেন।[২৩] আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪০ হিঃ) জনৈক তাঁতীর দোকানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৪] বিভিন্ন যুগে এভাবে পাঠদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৩) মসজিদ :

স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠনের জন্য মসজিদ ছিল সবচেয়ে পসন্দের জায়গা। মুখাওয়াল বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁর দশজন ছাহাবীকে মসজিদে ক্বোবায় জ্ঞান আহরণে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং তিনি তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন।[২৫] তবে মসজিদ কেন্দ্রিক পঠন-পাঠনের বিষয়টি কমবেশী বড় শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষায়তন খুঁজে পাওয়ার ঘটনা ছিল বিরল। বাগদাদ, দামেশক বা কায়রোর মতো বড় শহরগুলিতে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল অগণিত। তাই শহরের ছোট-বড় অসংখ্য মসজিদে পাঠদান চলত।

বড় শহরগুলিতে মসজিদ ছিল দুই ধরনের। একটা হ'ল সাধারণ মসজিদ, যেখানে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত অনুষ্ঠিত হ'ত। অপরটি হ'ল জামে মসজিদ, যেখানে শুক্রবার জুম'আর ছালাতও অনুষ্ঠিত হ'ত। একটি মধ্যম মানের শহরে একাধিক জামে মসজিদ থাকত। উদাহরণস্বরূপ বাগদাদের কথা বলা যায়। হিজরী ৫ম শতকে বাগদাদে ৬টি জামে মসজিদ ছিল এবং বলা হয়ে থাকে, সেসময় পুরো বাগদাদ শহরে মোট মসজিদ ছিল তিন হাযার।[২৬]

এক একটি মসজিদে সম্ভবত এক বা একাধিক বিষয়ে এক বা একাধিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হ'ত। মসজিদের মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে পঠন-পাঠনের অনুমতি লাভের ক্ষেত্রে শক্ত কোন নিয়ম ছিল বলে মনে হয় না। কারণ অধিকাংশ মসজিদের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ চলত ওয়াকফের মাধ্যমে বা মসজিদের বিষয়াবলী দেখার জন্য একদল কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান থাকত। তবে জামে মসজিদের ক্ষেত্রে এমন বিধিনিষেধের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন খত্বীব বাগদাদী খলীফা কাইয়ূম বিল্লাহ্‌র নিকট 'জামে মানছূরে' হাদীছ বর্ণনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। 'জামে মানছূর' ছিল সেসময় রাজধানীর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এবং একই সাথে এটা সবচেয়ে স্বনামধন্য বিদ্যায়তনও ছিল। খলীফা একবার নাক্বীবে নুক্বাবার নিকট এই মর্মে সুফারিশপত্র লিখলেন যে, তিনি যেন খত্বীব বাগদাদীর পাঠদানে সহযোগিতা করেন। নাক্বীবে নুক্বাবা ছিলেন হাশেমীদের প্রধান রাজকর্মচারী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর তথা শরীফদের প্রধান নিবন্ধক। নাক্বীবে নুক্বাবার হয় সেসময় উক্ত মসজিদের তদারকির দায়িত্ব ছিল, নতুবা তিনি উক্ত মসজিদে সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের বিষয় দেখাশোনা করতেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, জামে মানছূর ছিল হাম্বলীদের শক্ত ঘাঁটি। অবশেষে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি-না দেখার জন্য খত্বীব বাগদাদীর প্রথম দরসে স্বয়ং নাক্বীবে নুক্বাবা হাযির হয়েছিলেন।

প্রায়ই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদে এক বা একাধিক বিষয় চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। আবার কখনো কখনো একটি মসজিদ বিশেষ কোন ইলম অধ্যয়নের জন্য পরিচিতি লাভ করত। এটা হ'ত সেখানে দরস প্রদানকারী শায়খদের খ্যাতির কারণে। এসব ক্ষেত্রে কখনো আবার পাঠদানকারী শায়খদের নামে মসজিদের নামকরণ হয়ে যেত। যেমন কুরআনের বিখ্যাত ক্বারী রুওয়াইম বিন ইয়াযীদের (মৃ. ২১১ হিঃ) নামে একটি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল। মসজিদটি বাগদাদের দারবে কাল্লাঈন এলাকায় অবস্থিত ছিল।[২৭] ৩৭৪ হিজরীতে যখন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আত-তাম্মার সেখানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখনও মসজিদটি উক্ত নামে পরিচিত ছিল।[২৮] বাগদাদের আরেকটি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের (মৃ. ১৮১ হিঃ) নামে। তিনি যদিও বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন না, তবে তিনি হয়ত তার বিভিন্ন সময় বাগদাদ সফরে সেখানে দরস প্রদান করেছেন। হিজরী ৫ম শতকে যখন শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ আবু হামেদ ইসফারায়ীনী (মৃ. ৪০৬ হিঃ) সেখানে দরস প্রদান করছিলেন, তখনও মসজিদটি উক্ত নামেই পরিচিত ছিল। ততদিনে মসজিদটি একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সাথে সাথে এটি বাগদাদের একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসাবেও গণ্য হ'ত। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দ ইসফারায়ীনীর দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য ভিড় জমাত। খত্বীব বাগদাদীর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সেখানে ৭০০ ছাত্র দরস গ্রহণ করত।[২৯] এভাবে মসজিদগুলি শত শত বছর ধরে বিদ্যাপীঠের ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি আলাদা ভবনসমৃদ্ধ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরও। অবশ্য প্রতিটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি করে মসজিদ থাকত।

ইলমী সমাবেশ, মজলিস এবং হালাকা :

ইলমী বৈঠকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য যে পরিভাষাটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হ'ত, তাহ'ল 'মজলিস'। অবশ্য শব্দটি

---

২২. *প্রাগুক্ত, ১১/১৩৭।*
২৩. *প্রাগুক্ত, ২/৭৯।*
২৪. *প্রাগুক্ত ২/৩৯।*
২৫. *আবু হামেদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ফাতিহাতুল উলূম (কায়রো : ১৩২২ হিঃ/১৯০৪ খ্রি.), পৃ. ১৯।*
২৬. *তারীখু বাগদাদ, ১/৩৯৯; আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল উদাবা, সম্পাদক : এ এফ রিফাঈ (কায়রো : ১৯৩৬-৮খ্রি.), ৪/১৬।*
২৭. *জি. লে. স্ট্রেঞ্জ, বাগদাদ আন্ডার দ্য আব্বাসীড ক্যালিফেট, (অক্সফোর্ড) পৃ. ৮১-৮৩।*
২৮. *তারীখু বাগদাদ, ৯/৩৯৪।*
২৯. *প্রাগুক্ত, ৪/৩৭০।*

আরো বেশ কিছু অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন পাঠদানের হল, দরস, শিক্ষকের আসন, পিলার বা চেয়ার সংলগ্ন স্থান বা ভবনের যেকোন জায়গা। পরিপূরক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করার মাধ্যমে একটি মজলিসের উদ্দেশ্য নির্ণীত হ'ত। যেমন 'মজলিসে তাদরীস' তথা পাঠদানের সভা, 'মজলিসে শু'আরা' তথা কবিদের সভা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত, হয়ত তার নামেই মজলিসের নামকরণ করা হ'ত। উদাহরণস্বরূপ 'মজলিসে মাহামিলীর' কথা বলা যায়। এটি মাহামিলীর বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত এবং এখানে মূলত ফিক্বহ ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হ'ত। মজলিসে শাফেঈ বাগদাদের জামে মানছূরে অনুষ্ঠিত হ'ত।[৩০] উপরোল্লেখিত দু'টি মজলিসই শায়খদ্বয়ের মৃত্যুর বহু পরেও স্ব স্ব নামে পরিচিত ছিল। আসলে মজলিসগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের নামে একাডেমিক চেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের স্মৃতি জাগরুক রাখত। সেসব চেয়ারে পরবর্তীতে বিখ্যাত শায়খদের নিয়োগ দেয়া হ'ত। যাহোক, খত্বীব বাগদাদীর জীবদ্দশায়ও মজলিসে মাহামিলী বিদ্যমান ছিল এবং তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন।[৩১]

ইলমী বৈঠকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য দ্বিতীয় যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হ'ত, সেটি হ'ল 'হালাকা' (পাঠচক্র)। দরসে সুবিন্যস্তভাবে বসার ধারণা হ'তে সম্ভবত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ছাত্ররা চারদিকে গোল হয়ে বসত, তবে শিক্ষকের সম্মুখভাগে বসা পসন্দনীয় ছিল। যদিও মজলিসের মতো সব ধরনের ইলমী বৈঠক বুঝাতে 'হালাকা'র প্রয়োগ করা যায়। তবুও এটার ব্যবহার বোধহয় সীমিত সংখ্যক ছাত্র নিয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এটি বিশেষত ভাষাবিজ্ঞান ও অন্য বেশকিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলিতে ছাত্রদেরকে মোটামুটি লম্বা সময় ধরে একজন শিক্ষকের অধীনে পড়াশোনা করতে হ'ত। 'হালাকায়ে খলীল নাহবী' (মৃ. ১৭৪ হিঃ) এ ধরনের হালাকার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। খলীলের মৃত্যুর পর তার ছাত্র ইউনুস নাহবী এই হালাকার হাল ধরেন।[৩২]

মনে করা হয়, জামে মসজিদে যে দরস অনুষ্ঠিত হ'ত, তাকে হালাকা বলা হ'ত এবং একটি জামে মসজিদে অনেকগুলি করে হালাকা বসত। প্রত্যেকটি হালাকায় একজন করে শিক্ষক থাকতেন।[৩৩] ইমাম শাফেঈ যখন বাগদাদ সফর করেন, তখন জামে মানছূরে ৪০-৫০টির মত হালাকা ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৩৪] ৩২৬ হিজরীতে কায়রোর জামে আমরে মালেকী মাযহাবের ১৫টি, শাফেঈ মাযহাবের ১৪টি এবং হানাফী মাযহাবের ৩টি করে হালাকা ছিল।[৩৫] কায়রো ও দামেশকে নিয়মিত বৈঠকগুলিকে 'আয-যাবিয়া' বলা হ'ত। যাবিয়াতে শাফেঈ', যেখানে তিনি সশরীরে দরস দিয়েছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উক্ত নামে পরিচিত ছিল। কায়রোর মসজিদে আযহার এবং জামে মামূর, যেটাকে দামেশকের গ্র্যাণ্ড মসজিদও বলা হয়, উভয়টিতে আটটি করে 'যাবিয়া' ছিল।

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ আবুবকর নাজ্জাদ (মৃ. ৩৪৮ হিঃ) জামে মানছূরে দু'টি হালাকার আয়োজন করতেন। শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পূর্বে ফিক্বহী মাসআলার জন্য একটি, আর অপরটি জুম'আর পর হাদীছ বর্ণনার জন্য।[৩৬] একই শহরের জামে রুসাফাতে হাদীছের ছাত্রদের আরেকটি হালাকা বসত।[৩৭] আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আহমাদ মারওয়াযীও (মৃ. ৩৪০ হিঃ) জামে মানছূরে একটি হালাকার আয়োজন করতেন। বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী (মৃ. ৩৩০ হিঃ) এখানে প্রতি শুক্রবার দরস দিতেন।[৩৮] আসলে একটি হালাকাতে কয়েকজন উস্তায দরস দিতেন, আবার এটাও সম্ভব যে কয়েকজন উস্তায কয়েকটি আলাদা আলাদা হালাকায় অংশগ্রহণ করতেন। মজলিস ও হালাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, তবে উভয়েরই মৃত শিক্ষকের নামে চেয়ার ছিল।

ছাত্রদের জন্য সাধারণত সব দরস উন্মুক্ত ছিল। তবে ব্যতিক্রম হ'ত সেসব বিষয়ে যেগুলি শিখতে দীর্ঘ সময় লাগত। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে কিছু ছাত্রকে বাছাই করতেন এবং তাদেরকে দরসে বসার অনুমতি দিতেন। আর যে বিষয় শেখানো হচ্ছে, সে অনুযায়ী ক্লাসের আকার ছোট বড় হ'ত। ফলে ফিক্বহ বা ব্যাকরণের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব সীমিত। কিন্তু হাদীছের ক্লাসগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা মাঝে-মধ্যে এত বেশী হ'ত যে, হাদীছ বর্ণনার জন্য শিক্ষককে বর্ণনা-সহকারী (মুসতামলী) নিয়োগ করতে হ'ত। যিনি শিক্ষকের বলা কথা একদম পেছনের সারিগুলির উদ্দেশ্য আবার বলতেন, যেখান থেকে হয়ত শিক্ষকের কথা ঠিকমতো শোনা যায়নি। কায়রোর জামে আমরে আবুবকর নি'আলীর (মৃ. ৩৮০ হিঃ) হালাকা এত বড় ছিল যে, মসজিদের সতেরোটি স্তম্ভ জুড়ে ছাত্ররা বসত।[৩৯] মুসতামলীর কাজ ছিল উস্তায বর্ণিত অংশটুকু পুনরায় বলা যাতে উপস্থিত প্রত্যেকে তা লিখে নিতে পারে।[৪০]

---

৩০. প্রাগুক্ত, ২/৫৬-৫৭।
৩১. প্রাগুক্ত, ১০/৩৯।
৩২. প্রাগুক্ত, ১১/৪০৪।
৩৩. জর্জ মাকদেসী, দি রাইজ অব কলেজেস : ইনস্টিটিউশনস অব লার্নিং ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট (এডিনবার্গ : ১৯৮১), পৃ. ১৭-১৮।
৩৪. তারীখু বাগদাদ, ২/৬৮-৬৯।
৩৫. ইবনু সাঈদ আলী বিন মূসা আল-মাগরিবী, আল-মুগরিব ফী হুলাল মাগরিব (লাইডেন : ১৮৯৮), পৃ. ২৪।
৩৬. তারীখু বাগদাদ, ৪/১৯০।
৩৭. প্রাগুক্ত, ৪/৩৮।
৩৮. প্রাগুক্ত, ১১/৩৪৬-৭।
৩৯. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারা, ২/৯১।
৪০. Max Weisweiler, "Das Amt des Mustamli in der arabischen Wissenschaft", Oriens, 4 (1951. pp. 27-56; 'Abd al-Karim b. Muhammad al-Sam'ani, Adab al-Imla' wa 'li-istimla' (Die Methodik des Diktierens). Edited by Max Weisweiler. (Leiden, 1952).

মুসতামলীর দায়িত্ব ছিল শিক্ষকের বলা অংশটুকু কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াই পুনরাবৃত্তি করা। একজন মুসতামলীর ব্যাপারে জানা যায়, পুনরাবৃত্তির সময় ভুল করার কারণে উস্তায তাকে তিরস্কার করেন এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনার জন্য নছীহত করেন।[৪১] প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবাওয়াইহ (মৃ. ১৯৪ হিঃ) সম্পর্কেও এমন কথা শোনা যায়। তিনি প্রথম জীবনে একজন মুসতামলী ছিলেন। একবার একটি হাদীছের ক্লাসে পুনরাবৃত্তির সময় ব্যাকরণগত ভুল করায় পরবর্তীতে তিনি তার গবেষণার ক্ষেত্র বদলে ফেলেন।[৪২] এমন আরেকটি ঘটনা হ'ল, একবার একটি বড় দরসে তিনজন মুসতামলী নিযুক্ত করার পরও ছাত্ররা ঠিকমতো পড়া শুনতে পাচ্ছিল না। ফলে প্রখ্যাত মুসতামলী হারূন বিন সুফিয়ান আদ-দীককে ডাকা হয়। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এবং তিনি কাজটি পুরোপুরি একাই করতেন।[৪৩] এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, মুসতামলীর কাজটি একটি উল্লেখযোগ্য পেশায় পরিণত হয়েছিল।[৪৪] কতিপয় শিক্ষক বহু বছর যাবৎ ব্যক্তিগত মুসতামলী রাখার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৪৫]

মুসতামলী সাধারণত ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়াতেন বা উঁচু আসনে বসতেন। যাতে প্রত্যেকে তাকে দেখতে ও শুনতে পায়। উস্তাযকে দরস শুরু করতে বলার পূর্বে মুসতামলী শিক্ষকের নাম, উপনাম ও বংশপদবী বলে নিতেন। মুসতামলীরা সম্ভবত আগেভাগে কিছু বিষয় নোট করে রাখতেন। কারণ ক্লাস শেষ হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ পাঠ তাদেরকে পুনরায় বলতে হ'ত।[৪৬] একইভাবে একেকটি শাস্ত্র শেষ করতে একেক রকম সময় লাগত। উদাহরণস্বরূপ হাদীছের কথা বলা যায়। হাদীছের ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে এক জায়গা হ'তে আরেক জায়গায়,[৪৭] এক শিক্ষক হ'তে আরেক শিক্ষকের নিকট যাতায়াত করত। এভাবে হাদীছ সংগ্রহ করে সেগুলি যাচাই-বাছাই করার পর একত্রে সংকলন করত।[৪৮] একজন শিক্ষক একবার আফসোস করে বললেন যে, তার ছাত্ররা মাত্র চার পাঁচ মাসের দরসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তার সংকলনটি সম্পূর্ণ করতে চল্লিশ বছর লেগেছে।[৪৯] হাদীছের পাঠ সম্পন্ন করার নির্ধারিত কোন বয়স ছিল না। ছাত্ররা দীর্ঘ সময় ধরে সংকলনকার্য চালিয়ে যাবে নাকি আগেভাগে বন্ধ করে দেবে, তা নির্ভর করত তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর। এক ছাত্রকে নিয়ে একটি মজার গল্প আছে। একবার যখন সে একটি বাজারের মধ্য দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল, তখন একটি লোক তার গতিরোধ করল। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি হাদীছের ছাত্র? ছাত্রটি অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি হাদীছের ছাত্র। কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন?' লোকটি উত্তর দিল, 'আহমাদ বিন হাম্বল বলতেন, তুমি যদি কাউকে রাস্তা দিয়ে ছুটতে দেখো, তাহ'লে নিশ্চিত জানবে সে হয় পাগল, না হয় হাদীছের ছাত্র'।[৫০] আহমাদ বিন হাম্বল নিজেও একদিন এক লোকের সামনে পড়েছিলেন, যখন তিনি পরবর্তী ক্লাসে সময়মত শরীক হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছিলেন। লোকটি তাকে বলল, 'এভাবে ছুটতে কি তোমার লজ্জা লাগে না? আর কতদিন তুমি এভাবে বাচ্চাদের সাথে দৌড়াবে বলে নিয়ত করেছ?' ইবনু হাম্বল উত্তর দিলেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত'।[৫১]

তবে কতিপয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ভিন্নতর চিত্র দেখা যেত। ভাষাবিজ্ঞান ও ফিক্বহের ছাত্ররা একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের অধীনে বেশ লম্বা সময় ধরে পাঠগ্রহণ করত। কথিত আছে, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া ছা'লাবের (মৃ. ২৯১ হিঃ) অন্যতম শিষ্য আবু মূসা আল-হামেয তাঁর নিকট ৪০ বছর ধরে ইলম অর্জন করেছিলেন।[৫২] তাফসীরের একজন শিক্ষক ছয় বছর ধরে তার কিতাবের দরস দিতেন।[৫৩]

প্রখ্যাত হানাফী ফক্বীহ আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হিঃ) সতেরো বছর ধরে তার উস্তায আবু হানীফার দরসে বসেছেন।[৫৪] আবু হানীফা নিজেও দশ বছর যাবৎ তার উস্তায হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মানের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।[৫৫] অবশেষে যেসময় বাগদাদ ও অন্যান্য জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হ'ল, ততদিনে ফিক্বহ শাস্ত্র চার বছরের একটি মানসম্মত কোর্সের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মাদ্রাসা-পূর্ব যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে ছাত্র শিক্ষক কারো জন্য কোন বয়সসীমা ছিল না। একজন যতদিন চাইত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত। আবার যখন সে নিজেকে যোগ্য বলে মনে করত এবং ছাত্ররা তাকে উস্তায হিসাবে গ্রহণ করত, তখন সে দরস দেয়া শুরু করত। ১৭ বছরের এক তরুণ হাদীছ বর্ণনার জন্য মজলিসের আয়োজন করেছিল।[৫৬] আরেকজনের বয়স ছিল ১৮, যখন হাদীছের ছাত্ররা তাকে দরস প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিল।[৫৭] তবে এটা সাধারণ চিত্র ছিল না। ওয়াক্বী' ইবনুল জার্রাহ (মৃ. ১৯৮ হিঃ) ৩৩ বছর বয়সে হাদীছ বর্ণনা করা শুরু করেন। এমনিভাবে ইবনে মাহদী যখন প্রথমবার পাঠদান করেন, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশও হয়নি।[৫৮] *[ক্রমশঃ]*

---

৪১. তারীখু বাগদাদ, ১২/৩৮।
৪২. প্রাগুক্ত, ১২/১৯৫, ১৯৭।
৪৩. প্রাগুক্ত, ৯/৩৩।
৪৪. প্রাগুক্ত, ৭/৪৬৮।
৪৫. প্রাগুক্ত, ৮/১০২-৩; ১২/৩৪।
৪৬. Max Weisweiler, "Das Amt des Mustamli in der arabischen Wissenschaft" p.47.
৪৭. মুনীরুদ্দীন আহমাদ, মুসলিম এজুকেশন অ্যান্ড দ্য স্কলারস, সোশ্যাল স্ট্যাটাস আপটু দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি মুসলিম এরা (ইলেভেনথ সেঞ্চুরি ক্রিশ্চিয়ান এরা) ইন দ্যা লাইট অফ তারীখ বাগদাদ (জুরিখ : ১৯৬৮) পৃ. ৪৩-৪৪।
৪৮. তারীখু বাগদাদ, ১১/২৬৫-৬৬।
৪৯. প্রাগুক্ত, ১২/৪০৭।
৫০. প্রাগুক্ত, ১৪/৩২৬।
৫১. প্রাগুক্ত, ৬/২৭৪।
৫২. প্রাগুক্ত, ৯/৬১।
৫৩. প্রাগুক্ত, ২/১৬৪।
৫৪. প্রাগুক্ত, ১৪/২৫২।
৫৫. প্রাগুক্ত, ১৩/৩৩৩।
৫৬. প্রাগুক্ত, ২/১৫।
৫৭. প্রাগুক্ত, ২/১০২।
৫৮. প্রাগুক্ত, ১৩/৪৬৮।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ভূমিকা :

বিংশ শতাব্দীতে যে সকল মুহাদ্দিছ ইলমে হাদীছের ময়দানে অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। যাঁর অনন্য সাধারণ অবদানের ফলে সারা বিশ্বে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের গুরুত্ব এবং হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের প্রতি আগ্রহ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতে হাদীছ থেকে সরাসরি দলীল গ্রহণের পথকে আরো সুগম করেছে। বিশেষত আধুনিক যুগে হাদীছ গবেষণায় তিনি এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে ইলমে হাদীছের বহু ছাত্র এখন ইলমুত তাখরীজের ময়দানে বিচরণ করছেন এবং সেখান থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করছেন।

ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি হাদীছকে প্রশ্নবিদ্ধকারী জাল ও যঈফ হাদীছসমূহকে চিহ্নিত করা এবং সাথে সাথে ছহীহ হাদীছসমূহকে বাছাই করার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী (রহঃ) যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তা যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা অতীব যরূরী। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর জীবনের নানা দিক ও বিভাগ এবং তাঁর মৌলিক রচনাবলী ও তাহক্বীক্বকৃত গ্রন্থাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হ'ল।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন। পিতার নাম নূহ নাজাতী আল-আলবানী। জন্মস্থান আলবেনিয়া হওয়ায় তাঁর উপাধি-আলবানী। তাঁর উপনাম আবূ আব্দুর রহমান। ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আলবেনিয়ার[১] রাজধানী উশকূদারায় এক দরিদ্র দ্বীনদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[২] বংশগতভাবে সম্ভ্রান্ত এই পরিবারটি ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল। পিতা শায়খ নূহ নাজাতী ইবনু আদম আল-আলবানী (মৃ. ১৯৫২ খৃ.) সমকালীন আরনাঊত্বী[৩] ওলামায়ে কেরামের মধ্যে হানাফী ফিক্বহের অন্যতম বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন।[৪] ওছমানী খেলাফতের (১২৯৯-১৯২৩ খৃ.) রাজধানী আসতানা (বর্তমান ইস্তাম্বুল)-এর বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন এবং দেশের মানুষের মাঝে দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। একপর্যায়ে তিনি দ্বীনী বিষয়ে মানুষের পথ নির্দেশক ও আস্থার কেন্দ্রে পরিণত হন। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর নিকটে মানুষ ফৎওয়া গ্রহণের জন্য আগমন করত।[৫]

সিরিয়ায় হিজরত :

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে আলবেনিয়ায় ওছমানী খেলাফতের পতনের পর দেশটির শাসক হিসাবে আহমাদ যোগো (১৯২২-১৯৩৯ খৃ.)-এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর শাসনামলে আলবেনিয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পথে হাটতে শুরু করে। জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কালচারের আক্রমণ শুরু হয়। তুরস্কে 'কামাল পাশা' যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিলুপ্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন, আহমাদ যোগো ঠিক একই পন্থায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে সমাজ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ, রীতি-পদ্ধতি বিদূরিত হ'তে থাকে। নারী-পুরুষের প্রকাশ্য অশ্লীলতা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম নারীদের হিজাব পরিত্যাগ করতে এবং পুরুষদের পশ্চিমা পোষাক পরিধান করতে বাধ্য করা হয়।[৬]

পরিস্থিতি বিবেচনায় ধর্ম রক্ষা ও মন্দ পরিণতি থেকে বাঁচতে বহু মানুষ হিজরতের পথ বেছে নেয়া শুরু করেন। আলবানীর পিতা নূহ নাজাতীও এ ভয়াবহ বিপদ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে মাতৃভূমি থেকে সিরিয়া হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। সিরিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বহু হাদীছ ও আছার বিদ্যমান থাকায় পূর্ব থেকেই তিনি দেশটির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।[৭] ফলে ৯ বছর বয়সে আলবানী পরিবারের সাথে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং উমাইয়া মসজিদের নিকটবর্তী রাজধানী দামেশকের পুরাতন শহর আমারায় বসবাস শুরু করেন।[৮]

---

১. *ইউরোপের মুসলিম (৫৬.৭%) অধ্যুষিত এই দেশটি ১৫শ শতকে ওছমানীয় খেলাফলের অধীনে আসে।*

২. *মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, আলবানী : হায়াতুহু, দা'ওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ (মিসর : দারুল গাদ্দিল জাদীদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭। বইটি মূলত আলবানী প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারের লেখ্যরূপ। যেটা ১৯৮৬/১৪০৭ হিজরীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র আবূ ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী জর্দান সফরকালে পাঁচটি ক্যাসেটে রেকর্ড গ্রহণ করেন। হুওয়াইনীর জোর আবেদনের পরও সবসময় তিনি অস্বীকৃতি জানাতেন এবং বলতেন যে, তার জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে বলার মত কিছু নেই। কিন্তু একপর্যায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি রাযী হন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ বাইয়ূমী তা লেখ্য রূপে প্রয়োজনীয় টীকাসহ প্রকাশ করেন। দ্র. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫-৬।*

৩. *'আরনাঊত্বী' শব্দটি দ্বারা আলবেনিয়া ও সাবেক যুগোস্লাভিয়া তথা বসনিয়া, কসোভো, সার্বিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সিরিয়ায় হিজরত কারীদের বুঝানো হ'ত। যেমন 'আরবী' দ্বারা মিসরী, সঊদী, সিরীয় তথা সকল আরবদের বুঝানো হয়। (দ্র. আতূীয়া ইবনু ছিদক্বী, ছাফহাতুন বায়যাউ মিন হায়াতিল ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (কায়রো : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২১।*

৪. *আলবানী : হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১১।*

৫. *ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল-আলী, নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ (দিমাশক : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।*

৬. *জিহাদ তুরবানী, মিআতুম মিন 'উযামাই উম্মাতিল ইসলামি গাইয়ার মাজরাত তারীখ (মিসর : দারুত তাক্বওয়া, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৩৩।*

৭. *সিরিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে হাফেয আবুল হাসান রাবাঈ (মৃ. ৪৪৪ হি.) রচিত فضائل الشام ودمشق নামে একটি বই রয়েছে, যেখানে দামেশক ও শামের ফযীলত বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীছ, আছার ও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ জমা করা হয়েছে। পরবর্তীতে আলবানী (রহঃ)-এর সাথে বিস্তারিত তাহক্বীক্ব সংযুক্ত করেন।*

৮. *ড. নাযযার আবাযাহ, তারীখু ওলামাই দিমাশক ফিল কারনিল খামিস 'আশার আল-হিজরী, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬৫৩।*

গভীর ধর্মীয় মুল্যবোধসম্পন্ন পরিবার হিসাবে স্বীয় সন্তানদেরকে দ্বীনদার ও পরহেযগার হিসাবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল পিতা নূহ নাজাতীর। সন্তানদেরকে সাথে নিয়েই সর্বদা মসজিদে গমন করতেন। মাঝে মাঝে বিশেষত জুম'আর দিনে বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদে যেতেন।[৯] এভাবে একান্ত দ্বীনী পরিবেশে আলবানী বেড়ে ওঠেন।

শিক্ষাজীবন :

শিক্ষাজীবনের শুরুতে তিনি দামেশকের বাযূরিয়া এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসাতুল ইস'আফ আল-খাইরিয়াহ-তে ভর্তি হন। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে উক্ত মাদ্রাসাটি ২ বছর ব্যাপী (১৯২৫-১৯২৭ খৃ.) সিরিয়া-ফ্রান্স যুদ্ধের সময় আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় সারূজা বাযারে অবস্থিত একটি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষাজীবনের শুরুতে আরবী ভাষায় তাঁর কোনই দখল ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর মধ্যে আরবীর প্রতি বিশেষ ঝোঁক তৈরী করে দেন। ফলে ভাষাগত দিক দিয়ে তিনি সিরীয় সহপাঠীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

তবে মাদ্রাসার বিধিবদ্ধ শিক্ষার ব্যাপারে শুরু থেকে পিতা নূহ নাজাতীর কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁর ধারণামতে তখন সিরিয়ার গতানুগতিক বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা হ'ত না। ফলে সেখানে ধর্মীয় গবেষণার বিভিন্ন স্তর পাড়ি দেওয়ার পরও বাস্তবে কোন আলেম তৈরী হওয়ার সুযোগ ছিল না।[১০]

তাই ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আলবানী পিতার নির্দেশনা মতে মাদ্রাসা থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর পিতা তাঁর জন্য ঘরোয়া পরিবেশে দ্বীনী ইলম অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একটি পাঠ্যসূচী তৈরী করে দেন। যার ভিত্তিতে তিনি পিতার নিকটে কুরআন-তাজবীদ, নাহু-ছরফ এবং হানাফী ফিক্বহের তা'লীম নিতে শুরু করেন।[১১] পিতার নিকটেই তিনি তাজবীদসহ হাফছ ইবনু আছেম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন এবং মুখতাছারুল কুদূরীর পাঠ গ্রহণ করেন। এছাড়াও শহরের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের ইমাম, পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশিষ্ট বিদ্বান ছূফী শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ বুরহানী (১৮৯২-১৯৬৭ খৃ.)-এর নিকটে তিনি হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح এবং আরবী ব্যাকরণের شذور الذهب সহ অলংকার শাস্ত্রের বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠ করেন।[১২]

ইলমে হাদীছের ময়দানে পদচারণার সূচনা :

ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠা আলবানী যৌবনের শুরু থেকেই অধ্যয়নের প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী। প্রথম জীবনে নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তিনি আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও রূপকথার ক্ল্যাসিক রচনা যেমন আলিফ লায়লা, সালাউদ্দীন আইয়ূবী, আনতারা ইবনু শাদ্দাদসহ দুঃসাহসী মনীষীদের জীবনকথা নিয়ে রচিত বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস গভীর অনুরাগের সাথে অধ্যয়ন করতেন।[১৩] এর মাধ্যমে তিনি ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করেন।

অন্যদিকে পিতার সাথে ঘড়ির দোকানেও ছিল তাঁর নিয়মিত যাওয়া-আসা। প্রতিদিন সকালে পিতার সাথে এসে দোকানে বসতেন। দীর্ঘ সময় কখনো অধ্যয়নে, কখনো ঘড়ি মেরামতে কাটাতেন। কাজের অবসরে বিশেষত আছরের ছালাতের পর চলে যেতেন উমাইয়া মসজিদে। সেখানে গিয়ে বসতেন বিভিন্ন শায়খের মজলিসে।[১৪]

অবসরে এই ঘোরাফেরার পথে উমাইয়া মসজিদের পশ্চিম দরজার পাশে এক মিসরীয় বৃদ্ধের বইয়ের দোকান থেকে তিনি বিভিন্ন বই ধার নিতেন। অতঃপর পাঠ শেষে ফেরত দিতেন। একদিন তিনি সেখানে প্রখ্যাত মিসরীয় বিদ্বান সৈয়দ রশীদ রেযা সম্পাদিত 'মাজাল্লাতুল মানার'-এর কয়েকটি সংখ্যা দেখতে পেলেন। চোখ বুলাতে বুলাতে রশীদ রেযার একটি প্রবন্ধ তাঁর নযরে আসলো। যেখানে তিনি ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটির ভাল-মন্দ দিক নিয়ে সমালোচনা পেশ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় ছূফীবাদ ও যঈফ-জাল হাদীছ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সাথে সাথে সেখানে উক্ত গ্রন্থটির ছহীহ-যঈফ বর্ণনাসমূহ বাছাই করার জন্য যায়নুদ্দীন 'ইরাক্বী রচিত المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار গ্রন্থটি অনুসরণীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রবন্ধটি পাঠ করার পর হাফেয ইরাক্বীর বইটি পড়ার জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো।

অতঃপর বাযারে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দারুল হালাবী থেকে বইটির ৪ খণ্ডে প্রকাশিত সংস্করণটির সন্ধান পেলেন। কিন্তু তা ক্রয়ের মত আর্থিক সংগতি না থাকায় দোকানদারকে অনেক অনুরোধ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বইটি ধার নিলেন। অতঃপর বাড়িতে ফিরে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। দীর্ঘ অধ্যয়নের পর হাফেয ইরাক্বীর সূক্ষ্ম তাখরীজ তাঁকে এতই আকৃষ্ট করল যে, তার হুবহু কপি নিজ হাতে লিখে নেওয়ার সংকল্প করলেন। যোহরের পর পিতা যখন বিশ্রামে যেতেন, তখন তিনি অনুলিখন শুরু করতেন। এভাবে অর্ধেক

---

৯. *মুহাম্মাদ মাজযূব, ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, (রিয়াদ : দারুশ শাওয়াফ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১/২৮৯।*

১০. *আলবানী বলেন, 'আমার ধারণা মতে এবং বাস্তব দর্শনে আমি বলতে পারি যে, যদি ঐ বিধিবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিই আমি অনুসরণ করতাম, তবে এখন যে অবস্থানে রয়েছি, হয়ত সেখানে আমি আসতে পারতাম না'। দ্র. ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ২২।*

১১. *ড. আব্দুল আযীয আস-সাদহান, আল-আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া 'ইবার (রিয়াদ : দারুত তাওহীদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৪।*

১২. *Abu Nasir Ibrahim Abdur Rauf & Abu Maryam Muslim Ameen, The biography of Great Muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Riyadh : Darussalam, 1st Edition, 2007), P. 26.*

১৩. *আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ, জুহূদুশ শায়খ আলবানী ফিল হাদীছ রিওয়ায়াতান ওয়া দিরায়াতান (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬।*

১৪. *আলবানী : হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১১-১২।*

লেখার পর তিনি অনুধাবন করলেন যে, বহু হাদীছের অর্থ ভালোভাবে না বুঝেই কেবল নকল করে চলেছেন। কেননা একদিকে তিনি অনারব। অন্যদিকে ইলমী ময়দানে নবাগত। সেকারণে অনেক হাদীছ অবোধ্য থেকে যাচ্ছে। তখন তিনি পিতার লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইবনুল আছীরের 'গারীবুল হাদীছ' সহ বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা ও দুর্বোধ্য শব্দ বিশ্লেষণ যোগ করার জন্য প্রথম থেকে পুনরায় কিতাবটি লেখা শুরু করলেন। বিস্তারিত টীকা সংযোজন করায় মতনের চেয়ে টীকাই বেশী হয়ে গেল। এরূপ কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর সামনে এমন একটা পথ সুগম হ'ল, যা পরবর্তীতে তাখরীজ সংক্রান্ত শক্তিশালী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছিল।[১৫]

আলবানী বলেন, 'আমার মনে হয় এ সময় গবেষণার পিছনে আমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলাম, সেটাই আমাকে তাখরীজ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় উৎসাহিত করেছিল এবং এ পথ পাড়ি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেননা তাখরীজের পাশাপাশি হাদীছের মূল মতন আত্মস্থ করার জন্য সেসময় আমাকে ভাষা, বালাগাত, গারীবুল হাদীছ সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছিল'।[১৬] শায়খ মাজযূব বলেন, 'শায়খ আমাকে তাঁর প্রথম লিখিত পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়েছিলেন। হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি ছিল ৩ খণ্ডে দু'হাযার ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী'।[১৭]

এভাবে ছোট্ট একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ইলমে হাদীছের পথে আলবানীর পদযাত্রা শুরু হয়। আলবানী বলেন, 'আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে প্রথমত আমি যে সালাফী মানহাজের উপর রয়েছি এবং দ্বিতীয়ত আমি যে যঈফ হাদীছ পৃথকীকরণের কাজে রয়েছি, এর কৃতিত্ব মাজাল্লাতুল মানার সম্পাদক সাইয়েদ রশীদ রেযার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা ঐ পত্রিকাটির মাধ্যমেই আমার হাদীছ গবেষণার সূচনা'।[১৮]

এটাই ছিল আলবানীর ইলমে হাদীছের পথে যাত্রা শুরুর কথা। এরপর কেবলই এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহা তাঁকে দিনের অধিকাংশ সময় দোকানের কাজ ফেলে অধ্যয়নে ব্যাপৃত রাখত। প্রথম পর্যায়ে তিনি পিতার লাইব্রেরীতে পড়াশুনা চালিয়ে যান। কিন্তু একজন কট্টর হানাফী বিদ্বানের লাইব্রেরী হিসাবে সেখানে মূলত হানাফী মাযহাবের ফিক্বহী গ্রন্থগুলোরই সমাহার ছিল। হাদীছের কিতাব ছিল যৎসামান্যই। অন্যদিকে আলবানীর চাহিদা হাদীছের কিতাব। তাঁকে চাহিদামত বই কিনে দেওয়ার সামর্থ্যও পিতা নূহ নাজাতীর ছিল না। তাই প্রয়োজনীয় বই-পত্র এবং প্রাচীন ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহ অধ্যয়নের জন্য তিনি দামেশকের বিখ্যাত লাইব্রেরী 'মাকতাবা যাহেরিয়ায়'[১৯] যাওয়া-আসা শুরু করেন। এরই মাঝে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে সমকালীন সিরীয় বিদ্বান প্রফেসর মুহাম্মাদ আল-মুবারকের (১৯১২-১৯৮২ খৃ.)। একবার তিনি তাঁর সাথে হালবের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিছ শায়খ রাগেব আত-তাব্বাখের (১৮৭৭-১৯৫১ খৃ.) নিকটে গেলে ইলমে হাদীছের ময়দানে আলবানীর তৎপরতা সম্পর্কে জেনে খুবই সন্তুষ্ট হন। অতঃপর সার্বিক বিবেচনায় আলবানীর ব্যাপারে আশ্বস্ত হন এবং তাঁকে স্বীয় গ্রন্থ الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية-এ সংকলিত হাদীছসমূহ বর্ণনার ইজাযত বা অনুমতি প্রদান করেন।[২০] এছাড়া তিনি অপর সিরীয় আলেম মুহাম্মাদ বাহজা বাইতারের (১৮৯৪-১৯৭৬ খৃ.) দরসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন।[২১]

হাদীছ গবেষণার ব্যাপারে পিতার অবস্থান :

শুরু থেকেই হাদীছের প্রতি আলবানীর ঐকান্তিক ভালোবাসা ও গভীর মনোনিবেশের ক্ষেত্রে তাঁর পিতার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আলবানী শারঈ বিধি-বিধান গ্রহণ করতেন হাদীছ থেকে। আর তাঁর পিতা গ্রহণ করতেন মাযহাবী গ্রন্থসমূহ থেকে। ফলে পিতার সাথে শারঈ মাসআলা-মাসায়েল ও সমাজের প্রচলিত নানা কুসংস্কারকেন্দ্রিক বিতর্ক লেগেই থাকত। কখনো কখনো এমন হ'ত যে, কোন মাসআলা নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে আলবানী কুরআন-হাদীছের দলীল এবং বিভিন্ন 'আক্বলী যুক্তির সাহায্যে এমন অকাট্য দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, পিতা নূহ উত্তর প্রদানের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কখনো তিনি কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চুপ থাকতেন। কখনো সন্তানের মতামত মেনে নিয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন।[২২]

আলবানী বলেন, 'স্বভাবতই ইলমে হাদীছের ক্ষেত্রে পিতার অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সর্বদাই আমাকে সতর্ক করে বলতেন, علم الحديث صنعة المفاليس অর্থাৎ ইলমে হাদীছে গবেষণা নিঃস্বদের কাজ'। তবে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আমাকে দৃঢ় রেখেছিলেন। একদিকে আমার ছিল সুন্নাহ তথা হাদীছের জ্ঞান। আর তাঁর ছিল ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য স্থানের ভৌগলিক পড়াশুনা, যেখানে তিনি অধ্যয়নে বিপুল সময় ব্যয় করেছিলেন। আলোচনার সময় আমি হাদীছ থেকে দলীল পেশ করতাম, আর তিনি মাযহাব থেকে দলীল পেশ করতেন। একপর্যায়ে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আমি প্রশস্ত হৃদয় থাকতাম। কেননা আমি তো তখন যুবক, আর তিনি ছিলেন বৃদ্ধ।

---

১৫. *আলবানী : হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১২-১৩।*
১৬. *মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু ওয়া ছানাউল ওলামা 'আলাইহি (কায়রো : মাকতাবা সাদাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪৭।*
১৭. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯২।*
১৮. *নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ১৪।*
১৯. *১২৯৬ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরীটি সিরিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক লাইব্রেরী। কেবল বিপুল গ্রন্থরাজি সংরক্ষণের জন্য নয়, বরং এটি প্রাচীন ও বিরল পাণ্ডুলিপিসমূহ সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত। এখানকার সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপিটি হিজরী ৩য় শতকের। এর হস্তলিখিত গ্রন্থ ও রিসালাসমূহের কোনটি লেখকের স্বহস্তে, কোনটি এর পাঠকের অথবা অন্য কোন নকলকারীর লিখিত। দ্র. হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫১।*
২০. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৪৬-৫২।*
২১. *আলবানীর আরেকজন শিক্ষক সম্পর্কে জানা যায়, যিনি হ'লেন শায়খ বাদরুদ্দীন আল-হুসাইনী। তার বেশ কিছু দারসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। দ্র. আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া 'ইবার, পৃ. ১৪।*
২২. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯১।*

তবে জীবন সায়াহ্নে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আমার কাছাকাছি মত প্রকাশ করতেন। যেমন সেসময় তিনি অনেক বিতর্কের পরে বলতেন, أنا لا أنكر أنك عدت إلي ببعض الفوائد العلمية التي لم أكن على بينة منها قبل ذلك، 'আমি অস্বীকার করছি না যে, তুমি আমার সামনে এমন কিছু জ্ঞান নিয়ে এসেছ, যেগুলো পূর্বে আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না'।[২৩]

তিনি বলেন, 'এভাবে অধিকাংশ সময় আমরা জ্ঞানগর্ভ বিতর্কের মাঝে অতিবাহিত করতাম। আর ইলমুল হাদীছ নিয়ে আমার অবিরত গবেষণার কারণে সেসময় ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তিসমূহ আমার নিকটে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতে শুরু করে'।[২৪]

শিক্ষকের সাথে বিরোধ :

পিতা নূহ নাজাতীসহ আলবানীর শিক্ষকগণ উমাইয়া মসজিদে ছালাত আদায় করাকে বিশেষ ফযীলতপূর্ণ মনে করতেন। মূলত তাঁরা হানাফী আলেমদের লিখিত হাশিয়া ইবনু আবিদীনসহ বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থে এর ফযীলত বর্ণনায় লিখিত কিছু বক্তব্য ও আছার[২৫] দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যেখানে বর্ণনাগুলোর সূত্র হিসাবে 'তারীখু দিমাশক' উল্লেখ ছিল। আলবানী বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর নির্মিত একটি মসজিদ সম্পর্কে এরূপ আছার বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি আমি অনুধাবন করতে পারতাম না। আর স্বভাবতই ফযীলত বর্ণনায় এসব বাড়াবাড়ি মেনে নেওয়ার জন্য আমি কখনোই প্রস্তুত ছিলাম না'।

বছরখানেক পর তিনি 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় ইবনু আসাকির (রহঃ) রচিত 'তারীখু মাদীনাতি দিমাশক'-এর ১৭ খণ্ডের মূল হস্তলিখিত সুবিশাল গ্রন্থটি অধ্যয়নের সুযোগ পান। গবেষণার একপর্যায়ে তিনি কাঙ্খিত বর্ণনাটি খুঁজে পান। কিন্তু দেখেন কোন সনদ ছাড়াই এটি সংকলিত হয়েছে। অতঃপর সেখানে তিনি উক্ত মসজিদে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর কবর থাকার বিষয়টিও পেলেন। এভাবে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, কবর থাকার কারণে উমাইয়া মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে না।

অতঃপর তিনি হাদীছ ও ফিক্বহ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়ে ৩-৪ পৃষ্ঠার মধ্যে কবরের উপর নির্মিত মসজিদে ছালাত আদায়ের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা লিখে স্বীয় শিক্ষক শায়খ বুরহানীর নিকটে পেশ করলেন। সময়টি ছিল রামাযান মাস। স্মিত হেসে শায়খ বুরহানী ঈদের পর এর জবাব দিবেন বলে জানালেন। কিন্তু ঈদের পরে তিনি বললেন, 'তুমি এখানে যা কিছু জমা করেছ, তা মূল্যহীন। কারণ যেসব গ্রন্থ থেকে তুমি দলীল গ্রহণ করেছ, সেগুলো আমাদের নিকটে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়। আমাদের নিকটে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হ'ল 'মারাক্বিউল ফালাহ', 'হাশিয়া ইবনু আবিদীন' ইত্যাদি। আলবানী বললেন, 'আমি তো ইবনু মালিক হানাফীর 'মাবারিকুল আযহার শারহু মাশারিকিল আনওয়ার', মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীর 'মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে দলীল পেশ করেছি'। তিনি বললেন, 'এগুলোর কোন মূল্য নেই আমাদের নিকটে। ...আর যেসব হাদীছ তুমি পেশ করেছ সেগুলো গুরুত্বহীন। কেননা দ্বীনী বিষয়ে আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্র হ'ল ফিক্বহের কিতাবসমূহ, হাদীছের কিতাব নয়।'

আলবানী বলেন, 'তাঁর এ জবাব আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমি বুঝতে পারি যে, আমি যা লিখেছি, শায়খ তা অনুধাবন করতে পারেননি। যদিও আমার আলোচনা ছিল 'উমদাতুল ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাশারিকুল আনওয়ার ও হাশিয়াতুত তাহতাবী থেকে। যেগুলো বিদ্বানগণের নিকটে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র...'।

এভাবেই আলবানীর সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর উক্ত পুস্তিকাটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম লেখনী, যা পরবর্তীতে বর্ধিত আকারে تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد নামে প্রকাশিত হয়।[২৬] এছাড়া তাঁর তাখরীজকৃত প্রথম গ্রন্থটি ছিল الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير। তবে এখনো তা পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে।

পিতার সাথে মতবিরোধ :

হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে পিতা নূহ নাজাতী নিজ সন্তানসহ ছাত্রদের স্বীয় মাযহাবের উপর দৃঢ় রাখতে ছিলেন সদা তৎপর। কিন্তু আলবানী শুরু থেকেই ছিলেন ভিন্ন মানসিকতার। বিশেষত কুরআন ও হাদীছের উপর বিস্তর অধ্যয়ন ও যেকোন বিধানের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের মানসিকতার কারণে তাঁর নিকটে সমাজে প্রচলিত নানা বিভ্রান্তি, শিরক ও বিদ'আতী কার্যক্রম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খুঁজে পান কুরআন-হাদীছের সাথে প্রচলিত মাযহাবসমূহের বহু মাসআলা-মাসায়েলের যোজন যোজন ব্যবধান।

সেসময় বিভিন্ন মসজিদে হানাফী এবং শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীদের দু'টি করে জামা'আত হ'ত। প্রথমে হানাফী জামা'আত শেষ হওয়ার পর শাফেঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হ'ত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সিরিয়ায় তাজুদ্দীন নামে একজন শাফেঈ শাসক ক্ষমতাসীন হন এবং তিনি হানাফীদের পূর্বে শাফেঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ জারী করেন। এমতাবস্থায় আলবানী দ্বিতীয় জামা'আতে ছালাত আদায়ের কোন দলীল না পেয়ে শাফেঈদের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা শুরু করেন।

কিন্তু একবার হানাফী জামা'আতের ইমাম শায়খ বুরহানী হজ্জ বা ওমরার সফরে গমনের কারণে আলবানীর পিতাকে

---

২৩. ঐ, পৃ. ১/২৮৯।
২৪. আলবানী : হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১৪।
২৫. উক্ত আছারটি হ'ল- সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) হ'তে বর্ণিত, উমাইয়া মসজিদে ছালাত আদায় সত্তর হাযার ছালাত আদায়ের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ।
২৬. আলবানী : হায়াতুহু, দা'ওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ, পৃ. ১৫-১৭; নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর, পৃ. ১২।

ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে যান। অবস্থা এমন হ'ল যে, একদিকে আলবানী প্রথম জামা'আতে ছালাত আদায় করছেন, অন্যদিকে তাঁর পিতা নূহ নাজাতী দ্বিতীয় জামা'আতে ইমামতি করছেন। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে গেল, যেদিন তিনি ব্যক্তিগত সফর উপলক্ষে আলবানীকে দ্বিতীয় জামা'আতে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। স্পষ্টভাষী আলবানী স্বীয় পিতাকে বললেন, 'এ বিষয়ে আপনি তো আমার মতামত জানেন যে, আমি প্রথম জামা'আতে ছালাত আদায় করি। এমতাবস্থায় স্ববিরোধী কাজ করা আমার জন্য খুবই কঠিন'। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধ তীব্রতর হ'ল। অতঃপর একদিন পিতা তাকে গৃহকোণে ডেকে বললেন, তাহ'লে এটাই কি সত্য যে, তুমি তোমার মাযহাব পরিত্যাগ করেছ? তুমি কি আর হানাফী মাযহাবে ফিরে আসবে না? আলবানী বলেন, এসব বলতে বলতে তিনি আমার আরো নিকটবর্তী হ'লেন। অন্যদিকে তাঁর কণ্ঠও উঁচু হ'তে লাগল। একপর্যায়ে বললেন, হয় তোমাকে আমার সাথে একমত হ'তে হবে, অন্যথা পৃথক থাকবে। আলবানী পিতার নিকট থেকে তিনদিন সময় চেয়ে নিলেন। অতঃপর পিতা প্রদত্ত ২৫ সিরীয় লিরা হাতে নিয়ে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর।[২৭]

মাযহাবী বিরোধ ছাড়াও আরো কিছু কারণে পিতার সাথে আলবানীর মতবিরোধ সৃষ্টি হ'ত। তা ছিল কিছু কুসংস্কারের ব্যাপারে তাঁর অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন। যেমন তাঁর কন্যা তথা আলবানীর বোনের ব্যাপারে অনেক বিবাহ প্রস্তাব আসত। কিন্তু ছোটখাট কারণ দেখিয়ে তিনি সেসব প্রত্যাখ্যান করতেন। হয়ত কোন পাত্র সৎ, কিন্তু তার ভাই পুলিশ হওয়ার কারণে ইংরেজদের মত হ্যাট পরে। কেউ অতি ধার্মিক কিন্তু তার কোন আত্মীয়ের বাসায় রেডিও আছে। এমনকি দামেশকে তাঁর এক পরিচিত ও আলেম বন্ধু তাঁর মেয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, 'তুমি আমার নিকটে উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু হায়! যদি তুমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী না হয়ে হানাফী মাযহাবের হ'তে!'

পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে আরেকটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। তা হ'ল, পিতা নূহ নাজাতীর ধারণা ছিল যে, দাঁত ফিলিং করলে বা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত ভরাট করে নিলে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে তার ছালাতও কবুলযোগ্য হয় না। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারী বহু আলবেনীয় মুহাজিরও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। একবার আলবানী দাঁত ফিলিং করেন। অতঃপর খবরটি পিতার নিকটে পৌঁছে গেলে তিনি শর্ত দেন যে, হয় দাঁত তুলে ফেলতে হবে অন্যথা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আলবানী দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করেন...।[২৮]

পিতৃগৃহ থেকে বিদায়ের পর হতোদ্যম না হয়ে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। তবে এজন্য তাঁকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে সিরিয়ায় তাঁর মত একই চিন্তাধারার একদল সাথী পেয়েছিলেন। বাযারে যাদের একজনের দোকান ছিল। তার সাথে একই স্থানে তিনি নিজের জন্য একটি দোকান ভাড়া নেন এবং পিতা প্রদত্ত বেশ কিছু পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘড়ি মেরামতের কাজ শুরু করেন। ঘড়ি মেরামতের ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর গ্রাহকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।[২৯] *(চলবে)*

---

২৭. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আহদাছুন মুছীরাহ মিন হায়াতিশ শায়খ আলবানী (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল ঈমান, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৩।*

২৮. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯০।*

২৯. *আলবানী : হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১৯।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

তোর মতো ছালাত পড়া তো জীবনে কোথাও দেখিনি!

আমার আব্বা ব্যাংকার ছিলেন। প্রথমে গ্রামীণ ব্যাংকে চাকুরী করতেন। পরবর্তীতে জনতা ব্যাংকে যোগ দেন। সপ্তাহে দুইদিন শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকায় তিনি বৃহস্পতিবার বাড়িতে আসতেন। অন্যান্য ছালাত না পড়লেও পিতার সাথে জুম'আ পড়াটাই ছিল আমার অভ্যাস। আমাদের বংশের প্রায় সকলেই ছিলেন 'মাইজভাণ্ডারী' তরীকার চরম অনুগত। পীর ছাহেব যা বলতেন, সে মোতাবেক কাজ করাটাই ছিল দাদা, পিতা, চাচা ও অন্যান্য স্বজনদের ব্রত। নতুন ভক্ত সংগ্রহ, দরবারে গমন, ওরস, হালকায়ে যিকর উপলক্ষে চাঁদা আদায় ও প্রদান সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আমাদের বংশ ও পরিবার ছিল অগ্রগামী। গ্রামে পীর ছাহেবের আগমন হ'লে আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করতেন। বার্ষিক ওরসে আব্বা, দাদা পুরো পরিবার নিয়ে যেতেন। এছাড়াও দো'আ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মাঝে-মধ্যেই দেখা করতেন। আমাদের জন্য তাবাররুক নিয়ে আসতেন। তাবাররুক পেয়ে ছোট্টবেলার এই আমি তখন বেজায় খুশি। খেতেও অনেক মজা।

আমার বয়স তখন ৭/৮ বৎসর। ওরসে আব্বার সাথে গেলাম। বড় বড় ডেকচিতে রান্না চড়ানো হয়েছে। অনেক লোকজন। আমরা এক সময় পীরের কাছে পৌঁছলাম। আব্বা পীরকে সিজদা করলেন (নাঊযুবিল্লাহ)! অন্যরাও এমন করছেন। পীর ছাহেব আব্বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আব্বার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। তারপর পীরের পূর্বসূরী এক পীরের কবরের কাছে গেলাম। সেখানে ভক্তকূলকে পানি পান করতে দেয়া হচ্ছে। কবর ধোয়া পানি কি-না মনে নেই। তবে সকলেই খুব আগ্রহের সাথে বরকতের জন্য বিভিন্ন নিয়ত করে পান করছেন। আব্বাও পান করলেন।

আমাদের পরিবারে গান-বাজনার দিকে অত্যধিক ঝোঁক ছিল। আমার বোনেরা পড়ালেখার পাশাপাশি গান ও খেলাধূলায় পারদর্শী ছিলেন। আমিও এসব ব্যাপারে কম নই। পরিবারও উৎসাহ দিত সবসময়। প্রথম শ্রেণী থেকেই আমি গান করি। একবার ওরসে গিয়ে দেখি সেখানে ঢোল-তবলা, হারমেনিয়াম। এগুলো দেখে আমি বেজায় খুশি। আব্বা যেহেতু পীরের কাছের ভক্ত, তাই বায়না ধরলাম গান গাওয়ার। অনুমতি পেলাম। আগ্রহ নিয়ে হারমেনিয়াম বাজাতে থাকি। সারেগামা পা.. যতটুকু পারতাম ততটুক গাইলাম। আশপাশ থেকে অনেকেই বাহবা দিলেন। খানিক পর মূল শিল্পীদের গান ও বাজনা শুরু হ'ল। দেখলাম গানের সাথে সাথে পুরুষ-মহিলা উপস্থিত সকলেই নাচছেন। এটাই নাকি ইবাদত *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি ক্লাসের একজন শিক্ষক বললেন, পীর বা কবরকে সিজদাহ করা হারাম। জীবনের প্রথম এই কথা শুনলাম। আব্বাকে বললাম, স্যার তো এই কথা বলেছেন। আব্বা বললেন, না, একথা ঠিক নয়। নেক মানুষের ছোহবত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। পীর ধরতে হবে। পীর-মুরীদী না হ'লে কে সুপারিশ করবে? স্যারের কথার বিপরীতে আব্বাকেই অগ্রাধিকার দিলাম। কারণ পরিবার, প্রতিবেশীসহ সবাই এমনভাবে জীবনযাপন করছেন, সবাই কোন না কোনভাবে পীর-মুরীদীর সাথে সম্পৃক্ত। কেউ মাইজভাণ্ডারী, কেউ রাজাপুরী, কেউ কালিয়াপুরী, কেউ চরমোনাই, কেউ ছারছিনা ইত্যাদি নামে-বেনামের পীরদের সাথে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। ৫ম শ্রেণীতে পড়াবস্থায়ই আব্বা ২য় বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তখন আমার বোনেরা অনার্স ১ম ও ২য় বর্ষে পড়েন। ছোটকাল থেকেই দূরন্তপনা করতাম। আব্বার মৃত্যুর পর সেটা আরো বেড়ে যায়। আম্মু গ্রাম থেকে কুমিল্লা শহরে নিয়ে আসেন। স্কুলে ভর্তি করে দেন। সন্তানের সাহচর্যে থাকতে এখানেই বাসা ভাড়া নেন। স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি স্থানীয় মসজিদের ইমামের নিকট কুরআন ও ছালাত শেখার ব্যবস্থা করেন। আমিও মনোযোগ সহকারে শিখতে থাকি। প্রায়ই চার ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতাম। অবশ্য হানাফী মাযহাব অনুসারেই।

আসলে মাযহাব কি? ইসলাম কি? এতটা জানাশোনা ছিল না। সবাই ছালাত পড়ে, সিজদা করে, আমিও করি, এরকমই ছিল মনোভাব। এভাবে একে একে বছর শেষে এসএসসি পাশ করি। এরই মাঝে আমার বড় বোনদেরও বিবাহ সম্পন্ন হয়। বড় আপু ঢাকা, মিরপুর-২ এ থাকেন। সে সুবাদে ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তি হই। বড় আপুর বাসায় থেকে কলেজে যাতায়াত করি। নতুন জীবনে নতুন পরিবেশে এসে পিছনের সব ভুলে যাই। নিয়মিত ছালাত আদায় না করতে করতে একদম ছেড়েই দেই। জুম'আতে সীমাবদ্ধ থাকে জীবন। সিওসি গেমে আসক্ত হয়ে পড়ি। সময়ের ব্যবধানে এই গেম খেলাটাই জীবনের সব হয়ে পড়ে। ছালাত, পড়ালেখা সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে পড়ে। প্রথম সেমিস্টারে যাও রেজাল্ট ভালো ছিল কিন্তু পরবর্তী সেমিস্টারগুলো খারাপ হ'তে থাকে। মনও খারাপ হয়ে যায়। মিরপুর থেকে সিটি কলেজে যাওয়াটাও কষ্টকর হয়ে পড়ে যানজটের কারণে। কলেজে ক্লাস ও প্রাইভেট পড়ে বাসায় যেতে যেতে রাত হয়ে যায়। দূরত্বের কারণে আপুকে বললাম, আমি না হয় কলেজের কাছে মেস এ গিয়ে থাকি। অবস্থা বিবেচনা করে তিনিও সায় দিলেন।

আরও দু'জন সহপাঠীর সাথে একত্রে মেস ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠলাম। এক সময়ে গেমস খেলার পাশাপাশি পড়ালেখায়ও মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করি। তবে ইবাদতের তেমন ধার ধারতাম না। সহপাঠী একজনকে দেখতাম, বাসায় ছালাত আদায় করার সময় বুকে হাত বাধে, রাফঊল ইয়াদায়েন করে। অবাক হয়ে ভাবতাম এটা আবার কোন ছালাত! আমি ও অপর সহপাঠী হাসতাম আর তাকে তাচ্ছিল্য করতাম। কিরে ব্যাটা এভাবে কি ছালাত পড়িস! তোর মত ছালাত পড়া তো জীবনে কোথাও দেখিনি। মেয়েরাই না এভাবে ছালাত পড়ে। সে উত্তরে বলত, ছহীহ হাদীছে এভাবে আছে। (হেসে) কি বলিস, ছহীহ হাদীছ! দেশে এত এত আলেম তারা বুঝে না আর তুই ছহীহ হাদীছ বুঝিস? বাটপারি করার আর জায়গা পাস না। আরে ভাই শোন, আমরা তো সাধারণ পাবলিক আমাদের এত বুঝায় কাজ নেই। আর আমাদের বিষয়ও এটা না। আলেমরা যেটা বলে বুঝে শুনেই বলে। তাই তারা যেভাবে ইবাদত করতে বলে সেভাবেই কর। ভেজাল করার দরকার কি? আসলে ছোটবেলায় মৌলভীরা আমাদের মানসিকতাকে যেভাবে গড়ে তুলেছে, সেভাবেই সহপাঠীকে বললাম। কুরআন ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ আমাদের মতো সাধারণ লোকদের পড়ার দরকার নেই। আমরা এগুলো বুঝব না। তা মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক/ছাত্ররা পড়বে। আমরা শুধু তাদের কথামতো চলব।

বিবিধ রং-ঢং এর কথামালার ভিড়ে সময় বয়ে যায়। এরই মাঝে

এক সময়ে ইউটিউবে ড. যাকির নায়েক-এর ছালাত আদায়ের ভিডিও দেখে বিস্মিত হ'লাম। আরে উনিও দেখি বুকে হাত বেধে ছালাত আদায় করছেন। ড. যাকির নায়েকের প্রতি পূর্ব থেকে মনের গহীনে শ্রদ্ধাবোধ ছিল। কিন্তু তিনিও এভাবে ছালাত আদায়ের কথা বলছেন। না! ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ভাবনার দুয়ারগুলো অমলিন রেখেই সহপাঠীকে বললাম, আচ্ছা তুমি যেভাবে ছালাত আদায় করো তার সত্যতা উদ্‌ঘাটনের সহজ পন্থা কি? সে আমাকে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের ছালাত অধ্যায়ের হাদীছ সমূহের উদ্ধৃতি দিল। আমিও কুতুবুস সিত্তার হাদীছ গ্রন্থের এ্যাপ ডাউনলোড করে প্রতিটি গ্রন্থের ছালাত অধ্যায়ে চোখ বুলালাম। টানা এক সপ্তাহব্যাপী যাচাইয়ের পর বিস্ময় ও আতংকে হতবাক হয়ে গেলাম। দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ, হাযার হাযার উপাধিধারী আলেমরা কোন পথে আছে আর ছহীহ হাদীছের দেখানো পথ কোন দিকে! ছোটবেলা থেকে যা দেখছি ও শিখছি অধিকাংশই ভুল-ভ্রান্ত। ভয় ও আতংকে জ্বরে আক্রান্ত হ'লাম।

সুস্থ হয়ে ছালাত সংশোধন করে ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম। তাও বাহ্যিক সুন্নাতগুলো। রাফউল ইয়াদায়েন, বুকে হাত বাঁধা, ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাতে অংশগ্রহণ না করা। প্রথমদিকে আরিফ আযাদ ও ঐ ঘরাণার কিছু লেখকের লেখা পড়তাম।

বিশ্বে ও দেশে মহামারী কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামে ফিরলাম। গ্রামের মসজিদে ছালাত আদায় করি যতটুকু শিখেছি সেভাবে। মুছল্লীরা, স্বজন, প্রতিবেশী বিব্রত, কেউবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এটা কেমন ছালাত? বাড়িতে মায়ের কাছে নালিশ। ছেলেতো জঙ্গী হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বোনেরাও বিরক্ত ও শংকিত।

তাদের একমাত্র ভাই বখে গিয়েছে। অবস্থা এমন যে ঘরে বাইরে বিরোধীদের মাঝে আমি একা। বাইরে বিরোধীপক্ষ থাকলে ঘরে সমর্থন তো কেউ না কেউ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবাই একপক্ষ আর আমি একা একপক্ষ। দাড়ি ছেড়ে দেয়া সুন্নাত জানার পর দাড়ি বড় হ'তেই আরেক বিপত্তি। হঠাৎ এই বয়সে কেন দাড়ি রাখছি। দাড়ি কেটে ফেলতে হবে। এই বিষয়েও প্রতিনিয়ত পক্ষে-বিপক্ষে ক্রমাগত মানসিক চাপ প্রয়োগ।

পারিবারিক ও গ্রাম্য ফৎওয়া শুরু হ'ল। গ্রামের মুরব্বী মুছল্লীরা বলতে থাকলেন, মুফতী মুস্তাকুন্নবী কাসেমী কওমী আলেম। তিনি কুমিল্লা অঞ্চলে বুযুর্গ হিসাবে পরিচিত। মাদ্রাসা শিক্ষক ও বক্তা। তিনি বলেছেন, এভাবে যারা ছালাত আদায় করে তাদের কোন ছালাত হয় না। যাক, গ্রামের অজ্ঞ মানুষেরা বলে সহ্য করা যায়। কিন্তু ঘরে বোনের স্বামীও বলা শুরু করলেন যে, কুমিল্লা শহরে এক বড় আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, রাফউল ইয়াদায়েন সহ অন্যান্য আমলগুলো যারা করে তারা আমাদের অন্ত র্ভুক্ত নয়। তাদের ছালাত ও অন্যান্য আমল বাতিল!

ঘরে বাইরে বিবিধ আলোচনা, সমালোচনায় চুপ থাকাটাই উত্তম। আমিও চুপ থাকি আর ইউটিউব ফেসবুকে ঘাটাঘাটি করি। একদিন একটা বক্তব্য শুনলাম 'রব ও ইলাহ্‌র পার্থক্য'। তখন মনে একটু নাড়া দিল। এভাবে তো ভাবা হয়নি। সাধ্যের মধ্যে অনেক বই কিনে পড়তাম। অনলাইন থেকেও ডাউনলোড করতাম। অনলাইনে বই খুজঁতে গিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ওয়েবসাইট হঠাৎ চোখে পড়ে। আরে এরা আবার কারা? ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনেকগুলো বই দেখলাম। প্রথমেই পড়লাম অধ্যাপক নূরুল ইসলামের লেখা 'সাড়ে ষোল মাসের কারা স্মৃতি'। পড়তে পড়তে চোখের অশ্রু আর বাধ মানেনি। অনেক কেঁদেছি। সেই থেকে আহলেহাদীছদের সাথে পরিচয়। পূর্বে জানতামই না কারা আহলেহাদীছ। তাদের মানহাজ কি? ধীরে ধীরে আরো কিছু বই পড়লাম। আলহামদুলিল্লাহ! সেই থেকে 'আহলেহাদীছ' হওয়ার বাসনায় পথচলা। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কেও জানলাম।

যে ব্যাপারটা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রাথমিকভাবে আমরা যখন ছহীহ হাদীছের আলোকে সংশোধন হওয়ার চেষ্টারত থাকি, তখন বাহ্যিক সুন্নাতগুলো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আসলে নিজ জীবনের বাস্ত বতায় যা বুঝলাম, আমাদের প্রত্যেকের উচিত আক্বীদার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। অনেক ভাইকে দেখি রাফউল ইয়াদায়েন, জোরে আমীন, সম্মিলিত মুনাজাত নিয়ে খুবই উৎসাহী, কিন্তু আক্বীদা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও রাখেন না। মোটিভেশনাল বই পড়ে আপ্লুত হওয়া যায়, কিন্তু আক্বীদার শিক্ষা কোথায়? এক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনেরা যে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন আহলেহাদীছ মানহাজের আলেমদের লেখা আক্বীদার বইগুলো পড়া ও বক্তব্য শ্রবণটা বিশেষভাবে যরূরী। মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর ঐতিহাসিক রচনা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিতসহ' এবং 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ', মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.)-এর 'কিতাবুত তাওহীদ', শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' বইগুলো প্রত্যেকের মনোযোগ সহকারে পড়া যরূরী। আক্বীদা সঠিক না হ'লে সবই শূন্য।

আম্মাকে বারবার বুঝিয়েছি। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে আম্মাও বুঝেছেন। এখন তিনিও সাধ্যমতো অন্যদের এই মানহাজ সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করছেন। আপুরাও স্বামীসহ পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে আহলেহাদীছ মানহাজকে গ্রহণ করেছেন। পূর্বে গ্রামের যে মসজিদ থেকে বের করার জন্য বলা হ'ত, সেখানেই রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করছি। এখন আর অতীতের মতো ততটা কট্টর নয়। মূলতঃ হকের পথে চলতে গিয়ে আপনি যদি আপোষ করেন তাহ'লে হক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। নিজে হকের জ্ঞান অর্জন করে তার উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং নম্রভাবে দাওয়াত দিতে হবে। নয়তো পরিস্থিতি অনুকূলে না এসে প্রতিকূলে যাওয়াটা স্বাভাবিক।

নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন সমমনা তরুণ ইমরান, ইসমাঈল, জামশেদ, ডা. সারোয়ার জাহান, ছাকিব, ইকবাল, রায়হান ভাইদের সাথে পরিচয় হয়েছে। যারা শিরক-বিদ'আতের ঘুণেধরা সমাজে আহলেহাদীছ মানহাজ প্রচার ও প্রসারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পাশের গ্রামের শ্রদ্ধেয় নয়ন মোল্লা, মোশাররফ ভাই ও তাদের বন্ধুরা মিলে তো 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নামে একখণ্ড জমি দান করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র তত্ত্বাবধানে যেখানে পরিচালিত হবে মারকায। যাতে করে এই অঞ্চলে তাওহীদের আলোয় আলোকিত হবে বর্তমান ও পরবর্তী বংশধর ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ কাজগুলো সহজ করে দিন- আমীন!

-আকীকুল হাসান
পরিচালক, হিকমাহ শপ, লালমাই, কুমিল্লা।

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. شايخ ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান বলেন, خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته- لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسُق وتفجر تأكل وتشرب ما اشتهيت، 'আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে তোমার অনুগত করেছেন এগুলির সাহায্যে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। কারণ তুমি এগুলি ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারবে না এবং আল্লাহ্র ইবাদতেও রত হ'তে পারবে না। আল্লাহ তাঁর ইবাদত করার নিমিত্তেই এগুলিকে তোমার অনুগত করে দিয়েছেন। এজন্য নয় যে, তুমি এগুলির মাধ্যমে আনন্দ-উল্লাস করবে, দম্ভভরে পৃথিবীতে বিচরণ করবে, পাপে ডুবে থাকবে এবং মনের চাহিদা অনুযায়ী পানাহার করবে'।[১]

২. দাঊদ আত-ত্বাঈ (রহঃ) বলেন, ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে তাক্বওয়ার পথে নিয়ে আসেন, তখন তাকে সম্পদ ছাড়াই ধনী করে দেন, বংশীয় আভিজাত্য ছাড়াই তাকে সম্মানিত করেন এবং মানুষের অগোচরে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেন'।[২]

৩. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلاَثَةٌ: الْجُودُ مِنْ قِلَّةٍ، وَالْوَرَعُ فِي خَلْوَةٍ وَكَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ، 'সবচেয়ে কঠিন আমল তিনটি। (১) সম্পদ কম হওয়া সত্ত্বেও দান-ছাদাক্বাহ করা (২) নির্জনে-নিভৃতে আল্লাহকে ভয় করা এবং (৩) যার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা হয় ও যাকে দেখলে ভীতির সঞ্চার হয়, তার সামনে হক কথা বলা'।[৩]

৪. ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, لست آمركم بترك الدنيا، آمركم بترك الذنوب، ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل، 'আমি তোমাদেরকে দুনিয়া পরিত্যাগ করতে বলছি না। বরং তোমাদেরকে পাপ পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ দুনিয়াকে উপেক্ষা করা মর্যাদাপূর্ণ কাজ। কিন্তু পাপ পরিহার করা ফরয। সুতরাং নেকী ও ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ সম্পাদনের চেয়ে তোমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ফরযকে প্রতিষ্ঠা করা'।[৪]

৫. মূসা ইবনুল মু'আল্লা বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) আমাকে বলেন, يا موسى، ثلاث خصال إن كن فيك لم يترل من السماء خير إلا كان لك فيه نصيب- يكون عملك لله عز وجل وتحب للناس ما تحب لنفسك، وهذه الكسرة تَحَرَّ فيها ما قدرت، 'হে মূসা! তোমার মধ্যে যদি তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহ'লে আকাশ থেকে বর্ষিত প্রতিটি কল্যাণে তোমার জন্য একটি অংশ বরাদ্দ থাকবে। (১) তুমি একমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় আমল সম্পাদন করবে, (২) নিজের জন্য যেটা পসন্দ কর, মানুষের জন্যে সেটাই পসন্দ করবে এবং (৩) এক লোকমা খাদ্যের ক্ষেত্রেও সাধ্যমত (হালাল-হারাম) বাছ-বিচার করে চলবে'।[৫]

৬. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, لَا تَعْتَرِضْ لِمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقْوَامِ، وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ، وَلَا تَصْحَبْ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلَا تُطْلِعْهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ 'তুমি অনর্থক কোন কিছুতে জড়াবে না। তোমার শত্রুকে এড়িয়ে চলবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর আল্লাহভীরু ছাড়া কেউই বিশ্বস্ত নয়। তুমি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করবে না। অন্যথায় সে তোমাকে পাপের পথে ধাবিত করবে এবং তাকে তোমার গোপনীয় বিষয় জানাবে না। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে তোমার বিষয়ে অন্য কারু সাথে পরামর্শ করবে না'।[৬]

৭. 'আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন, مَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهَا بِالْأَشْوَاقِ وَمَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا لَهَا مُسْتَعِدٌّ 'কখনো এমন হয়নি যে, ছালাতের সময় হয়েছে, অথচ আমি ছালাতের প্রতি আগ্রহী ছিলাম না। আর কখনো এমনও হয়নি যে, ছালাতের ওয়াক্ত হয়েছে, অথচ আমি ছালাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না'।[৭]

৮. ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, فأعرف إني لأعصي الله، ذلك في خلق دابتي وجاريتي، 'আমি যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতা করি, তখন আমি এর কুপ্রভাব আমার গৃহপালিত পশু ও আমার পরিচারিকার আচরণ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি'।[৮]

---

১. *ছালেহ বিন ফাওযান, শারহুল ক্বাওয়া'ইদিল আরবা'আ, পৃ. ১৪।*
২. *ঐ, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৭৭।*
৩. *ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ২/৩০৪; ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪৩৫।*
৪. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২৯৭।*
৫. *ঐ ২/৪১২।*
৬. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৪৪৫০, সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব : আব্দুস সালাম বিন মুহসিন।*
৭. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৬৫।*
৮. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৩১।*

বিদেশী ফলের বিকল্প দেশী কোন ফল

প্রতিদিন টক-মিষ্টি যেকোন একটি ফল খাওয়া স্বাস্থ্যকর। সব ফলেই পুষ্টিগুণ বিদ্যমান। একেক ধরনের অসুস্থতায় আবার একেক ফল উপকারী। অনেকেই বিদেশী ফলের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন। অথচ বিদেশী ফলের তুলনায় দেশী ফলের পুষ্টিগুণ অনেক বেশী। দেশী ফল তুলনামূলক কম দামে কেনা যায়। জেনে নেওয়া যাক বিদেশী কোন ফলের মতো পুষ্টি দেশী কোন ফলেই বিদ্যমান আছে।

আপেল বনাম পেয়ারা, আমড়া বা জাম্বুরা :

আপেলের পরিবর্তে দেশী ফল পেয়ারা বা আমড়া খেতে পারেন। প্রতি ১০০ গ্রাম আপেলে আছে ৭৬ ক্যালরি, ১৮.১ গ্রাম শর্করা ও ২০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি। একই পরিমাণ পেয়ারা থেকে আপনি পাবেন ৫১ ক্যালরি, শর্করা ১১.২ গ্রাম আর ভিটামিন সি ২১০ মিলিগ্রাম।

আপেলের বদলে আমড়াও খেতে পারেন। আমড়ায় আছে ৬৬ ক্যালরি, ১৫ গ্রাম শর্করা ও ৯২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি। জাম্বুরা থেকেও আপেলের তুলনায় ঢের বেশী ভিটামিন সি মেলে। ১০০ গ্রাম জাম্বুরা থেকে ভিটামিন সি পাবেন ১০৫ মিলিগ্রাম।

আঙুরের বদলে বরই বা আনারস :

আঙুরের পরিবর্তে আনারস বা বরই খেতে পারেন অনায়াসে। হিসাব করলে দেখা যায়, আঙুরের আছে ৯৭ ক্যালরি, শর্করা ২৩.৬ গ্রাম, ভিটামিন সি ২৯ মিলিগ্রাম ও পটাশিয়াম ১৩৫ মিলিগ্রাম।

এদিকে বরইতে আছে ১০৪ ক্যালরি আর শর্করা ২৩.৮ গ্রাম। আনারসও আঙুরের বিকল্প হিসাবে খেতে পারেন। আনারসে আছে ৪২ ক্যালরি, ৯.৩ গ্রাম শর্করা ও ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন সি ২৬ মিলিগ্রাম।

মাল্টার পরিবর্তে কমলা :

আমাদের দেশে এখন কমলার চাষ হচ্ছে। কমলার দামও তাই আগের চেয়ে কম। কমলাকে দেশী-বিদেশী দুই ধরনের ফলই বলা যায়। দেশে মাল্টার চাষ হ'লেও এখনো তা কম। এই দু'টি ফলই ভিটামিন সিতে ভরপুর। একটা মাল্টায় মিলবে ৪৯ ক্যালরি আর ভিটামিন সি ৪৮.৫ মিলিগ্রাম। এদিকে একটা কমলায় আছে ৪৩ ক্যালরি আর ভিটামিন সি ৭০ মিলিগ্রাম।

বেরি, চেরি বনাম কালো জাম :

ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, চেরির মতো ফলগুলো আমাদের দেশে বেশ দাম দিয়ে কিনতে হয়। তবে আজকাল স্ট্রবেরির চাষ শুরু হওয়ায় ফলটি মৌসুমে কম দামে পাওয়া যায়। এসব ফলের বিকল্প হিসাবে জামের কথা বলা যায়। ব্লুবেরিতে আছে ৮.৫ ক্যালরি, শর্করা ১৯ গ্রাম, ভিটামিন সি ৩০ মিলিগ্রাম। স্ট্রবেরিতে আছে ৭০ ক্যালরি, ১৭ গ্রাম শর্করা ও ভিটামিন সি ৩১ মিলিগ্রাম। চেরিতে আছে ৮৭ ক্যালরি, শর্করা ২২ গ্রাম, ভিটামিন সি ৪২ মিলিগ্রাম। এদিকে জামে আছে শর্করা ১.৪ গ্রাম, ভিটামিন-এ ১২০ আইইউ ও ভিটামিন সি ৬০ মিলিগ্রাম। জামে ক্যালরি ও শর্করার পরিমাণ কম বলে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য ভালো।

অ্যাভোকাডোর বদলে কলা ও ডালিম :

অ্যাভোকাডোর পরিবর্তে কলা ও ডালিমকে রাখা যায়। অ্যাভোকাডোতে ১৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি আছে আর ডালিমে আছে ১৪ মিলিগ্রাম। তবে ডালিমে ক্যালরি অনেক কম, আর সেটা পুষিয়ে নিতে পারেন কলা খেয়ে। কারণ কলায় প্রচুর পরিমাণ ক্যালরি আছে। একটা কলা থেকেই ৮০ ক্যালরি পাওয়া সম্ভব।

এছাড়া ড্রাগন ফলের পরিবর্তে খেতে পারেন জামরুল। বাঙ্গি, জাম মোটামুটি শরীরে একই ধরনের পুষ্টির জোগান দেবে। ড্রাগন ফলে শর্করা কম থাকে। তেমনি জামরুল, বাঙ্গি, জামেও শর্করা কম। এই ফলগুলো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও ভালো।

[সংকলিত]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ডাচ বাংলা : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

শিক্ষার্থীদের পরিচর্যায় গড়ে উঠছে যে কলেজের কৃষি খামার

এ যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহুমুখী ব্যবহার। প্রতিষ্ঠানের মাঠের চারদিকে বেড়ে উঠেছে বাহারি জাতের সবজি ও ফলের গাছ। কোনটিতে ফল এসেছে। আবার কোনগুলো ফল দেওয়ার উপযোগী হয়ে উঠেছে। এগুলো চাষ ও পরিচর্যা করছেন প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষার্থীরা। পাবনার বেড়া উপযেলার কাশীনাথপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ মাঠে এমনই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা গেছে। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও গবেষক ড. আমীনুদ্দীন মৃধা এ উদ্যোগ নিয়েছেন।

'একজন শিক্ষার্থী একটি সমন্বিত কৃষি খামার' নামের একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করছেন ড. আমীন। পাইলট প্রকল্পটি সফল হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞও এ ধারণাটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আমীন বলেন, দেশের অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠের চার পাশ অব্যবহৃত থেকে যায়। শিক্ষার্থীদের অনেক সময় অবসর থাকে। পাঠের মাঝে তাদের মানসিক শান্তি দিতে বা সৃজনশীল কিছু করাতে পারলে তাদের দেহ-মন দু'টোই ভালো থাকবে। এ ধারণা থেকে তিনি এ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। প্রকল্পটির আওতায় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে কাজে লাগাতে চান এ গবেষক।

ড. আমীন বলেন, তার প্রস্তাবিত প্রকল্পে সরকারীভাবে কোন বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এ মডেল বাস্তবায়নে কোন অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। শাক-সবজির সামান্য বীজ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আনা ফলজ বা কাঠের গাছের চারা আনলেই হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাস্তার পাশে এবং রেললাইনের কাছের জায়গাও এ প্রকল্পে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ সজিনা গাছের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। এটি মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে যদি বাংলাদেশের তিন কোটিরও বেশি পরিবারের প্রতিটি ঘরে একটি বা দু'টি সজিনা গাছ লাগানো যায় তাহ'লে দেশে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৬০ লাখ সজিনা গাছ থাকবে।

কাশীনাথপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ মাঠে ড. আমীনের পাইলট প্রকল্পটি এরই মধ্যে এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কলেজের ভেতরে-বাইরে এখন যেন সবুজের মেলা। কলেজের ছাদ থেকে শুরু করে বারান্দা বা অফিস কক্ষ সব জায়গা নানা জাতের গাছ দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে তাদের সন্তুষ্টির কথা জানান।

স্থানীয় কলেজ শিক্ষক সালাহুদ্দীন আহমাদ বলেন, একজন শিক্ষার্থী তার অবসর সময়ে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'তে পারছেন। এতে সবজি বা ফলচাষের প্রতি তার একটা অভিজ্ঞতা ও হৃদ্যতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এ চর্চা তার বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে হবে। এটি তার সংসার জীবনেও কাজে লাগবে।

কলেজের দুই শিক্ষার্থীর বক্তব্য, তারা কলেজে সবজি ও ফলগাছের পরিচর্যা করেন। করোনাকালীন কলেজে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে এসেও তারা বাগান ঘুরে দেখে যেতে ভুল করেননি। এতে তাদের ভালো লাগা তৈরী হওয়ায় নিজ বাড়িতেও তারা এখন সবজি ও ফল চাষ করছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ রোকসানা খানম বলেন, পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে ধারণাটি সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হ'লে এ মডেলটি পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

ধারণা বদলে দিয়ে দিনাজপুরে গলদা চিংড়ি চাষে সাফল্য

সাধারণত দক্ষিণাঞ্চল কিংবা সমুদ্র উপকূলে লোনাপানিতে গলদা চিংড়ির চাষ হয়। প্রচলিত এ ধারণা বদলে দিয়ে উত্তরাঞ্চলের গলদা চিংড়ি চাষে সাফল্য দেখিয়েছেন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের ব্যবস্থাপক মুহাম্মাদ মূসা। মৎস্য চাষে সাফল্যের জন্য তিনি মৎস্য অধিদফতর থেকে পাঁচবার সেরা মৎস্য ব্যবস্থাপক হিসাবে সম্মাননা পেয়েছেন।

১৯৬৪ সালে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সরকারীভাবে ৫০ একর জমির ওপর স্থাপিত হয় উত্তর-পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ ও বীজ উৎপাদন খামার। নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে খামারটিতে উৎপাদনমুখী কাজে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুহাম্মাদ মূসা।

খামার সূত্রে জানা যায়, এ খামারে আছে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য ৪৬টি পুকুর, প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স ও আবাসিক ভবন। এখানে সিং, মাগুর, কই, গুলশা, ট্যাংরা ও পাবদা সহ বিভিন্ন প্রজাতির পোনা উৎপাদিত হচ্ছে এবং চাষীদের মধ্যে পোনা বিতরণ করা হচ্ছে।

তবে এবারই প্রথম এ খামারে এসেছে গলদা চিংড়ির উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য। এসব গলদা চিংড়ি বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ মূসা বলেন, এখানে গলদা চিংড়ি নয়, যেন সাদা সোনা উৎপাদিত হচ্ছে। অথচ একসময় ধারণা করা হয়েছিল, এ অঞ্চলের মাটি ও পানি চিংড়ি চাষের উপযুক্ত নয়। অথচ ২০২১ সালের জুনে এ খামারে ৪ দশমিক ৫০ লাখ গলদা চিংড়ি পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

মুহাম্মাদ মূসা বলেন, গলদা চিংড়ির পোস্ট লার্ভা (পিএল) উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবনচক্রের শুরুতে ব্রাইন ওয়াটার বা লোনাপানির দরকার হয়। এক্ষেত্রে কক্সবাযারের পেকুয়া থেকে লোনাপানি সংগ্রহ করে স্বাদুপানি বা মিঠাপানির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পিএল উৎপাদন করা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বরগুনার আমতলীর পায়রা নদী থেকে গলদা চিংড়ির মা মাছ (বড় মাছ) সংগ্রহ করে আনা হয়। মা মাছ থেকে লার্ভা সংগ্রহ করে ২৮-৩৫ দিনের মধ্যে পিএল উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে খামার থেকে প্রায় ১ হাযার ২০০ মাছচাষি পোনা নিয়ে চাষ করছেন।

[সংকলিত]

কবিতা

প্রার্থনা

মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার তরে
তুমি এক, অদ্বিতীয়, পথভ্রষ্ট করোনা মোরে,
জীবনের সকল মন্দ, হৃদয়ের গরিমা
হে আল্লাহ! দূর কর মোর মনের কালীমা।
এমন ঈমান দাও মোরে, যা যাবে না চলে
দৃঢ় ইয়াক্বীন দাও প্রভু, কুফরী যাবে টলে,
এমন রহমত দাও তুমি এ দুনিয়াতে
যাতে কামিয়াব হই পরকালে আখিরাতে।
অতি দরিদ্র ও প্রাচুর্য হ'তে বাঁচাও মোরে
যা নিয়ে যায় জাহান্নামের অতল গহ্বরে,
এমন আমল হ'তে কর মোরে পরিত্রাণ
যে আমল করে শুধু অপদস্ত-অপমান।
ইবলীস হ'তে আশ্রয় দাও তব চরণে
সদাই জাগ্রত রাখ মোরে তোমার স্মরণে,
হে আল্লাহ! আমি যে তোমার গুনাহগার সৃষ্টি
ক্বিয়ামতের দিন আমার প্রতি দিও শুভ দৃষ্টি।
দৃঢ় রেখ মোর পদযুগল পুলছিরাতে
যেন জাহান্নামে পড়ে না যাই সব হারাতে,
পাপ-পঙ্কিলতা হ'তে প্রভু রাখ মোরে দূরে
হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার তরে॥

পর্দা

মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
মহিষাশহর, আদিতমারী, লালমণিরহাট।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পর্দা প্রথা হ'ল জারী
হবে ধন্য মানলে সে আইন আখেরাতে দিবে পাড়ি।
লেজ কাটা নির্বংশের মত যে ব্যক্তিগণ যাবে
হাশরের মাঠে কোন অবস্থাতে তারা কূল কিনারা না পাবে।
দ্বীনের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)
সব কিছুকে ভুলে অনেকে পর্দা খুলে হারিয়েছে দু'কূল।
মরণের পরে বুঝতে পারবে পর্দা খেলাপ করার মজা
হিংস্র জানোয়ারের মত ছুটলে পাবে আখেরাতে সাজা।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমা পড়ে মুসলমান যদি হই
সংগৃহীত কুরআন ও হাদীছের বাণী সকলেই মেনে নেই।
স্থাপনার ভিতরে থাকতে হবে পর্দা এটা নয়
বাংলা ও বিশ্বের নারীর আপাদমস্তক ঢাকলেই পর্দা হয়।
দেশ-বিদেশে যাবে, হজ্জেও যেতে নেই মানা
স্বশরীরে তো যাবেই, তবে শর্ত সঙ্গে থাকবে আপনজনা।

জ্ঞান

আব্দুল মালেক
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

জ্ঞানের মত সম্পদ, আর যে কিছু নাই
জ্ঞানরাজ্যের বিশাল সীমা বুঝা ভারী দায়।
অন্যকে দান করলে জ্ঞান, তা আরও বাড়ে,
জ্ঞান সম্পদ তাইতো তাকে অমর করে ছাড়ে।
ধন যতই দান করবে বাহ্যত কমে যাবে,
জ্ঞান তুমি দান করলে তা আরো বৃদ্ধি পাবে।
দাতাগণ দানের হেতু মান-ইয্যত পায়
বিদ্বান তার জ্ঞান দান করলে কমে নাহি যায়।
ধনী লোক জ্ঞান বাড়ালে, মান-ইয্যত পায়
গরীব লোকে জ্ঞান বাড়ালে ঋষী যোগাড় হয়।
ধরার বুকে যত সব বীর বাহাদুর রয়েছে
সবচেয়ে বড় বীর যে জ্ঞানের বীর হয়েছে।
জ্ঞান চর্চায় জ্ঞানবীর মরেও তারা অমর
নামটি তার ধরার মাঝে থাকে চির ভাস্বর।

মুসলিম মুজাহিদ

ইউসুফ আল-আযাদ
প্রভাষক, হাবলা-টেঙ্গুরিয়া পাড়া ফাযিল মাদ্রাসা
টাঙ্গাইল।

দিনের শেষে আবার এসেছে রাত
এনেছে ডেকে তিমির অন্ধকার,
সাত সাগরের ফেনায় ফেনিয়া ওঠে
ঐ অতল পারাবার।
তুমি কখন জাগবে ওহে মুওয়ায্যিন
আযান দিবে ঐ মিনারে,
তবেই জাগবে মুসলিম মুজাহিদ
এসে দাঁড়াবে জামা'আতের কিনারে।
হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
গড়ে তুলবে বিশাল কাতার,
তুমি যদি না জাগ হে মুওয়ায্যিন
কাটবে নাকো আঁধার হবে না তো ভোর।
মোদের আমামা নিয়ে কে বাঁধিছে
তুমি সন্ধান নাও তার
প্রবঞ্চকের খোলসে চলিছে যালিম অত্যাচারী
অবসর তাকে দিয়ো না কো পালাবার।
তুমি কি শোন না মযলূমের আর্তধ্বনি
মার খেয়ে আসিছে নিঃসাড় হয়ে
ওহে মুসলিম! মুজাহিদ ঘুমিয়ো না আর
সময় যাচ্ছে ঐ বয়ে।
তুমি কি শোন না ওহে অসহায়ের আর্তনাদ
এই প্রান্তরে আবার ওঠেছে ফুটি
জাগ মুওয়ায্যিন জেগে ওঠো ফের
জাগতেই হবে সকল বাঁধা টুটি।

স্বদেশ

ভারতের স্বার্থে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে

-অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, ভারতের স্বার্থে রামপাল বিদ্যুৎ, রাশিয়ার স্বার্থে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, জাপানের স্বার্থে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প সমূহ বাতিল করতে হবে। কারণ এসব প্রকল্প দিয়ে লুটেরা রাশিয়া, ভারত ও চীনের কোম্পানীগুলি লাভবান হ'লেও বাংলাদেশের পরিবেশ বিপন্ন হবে, উদ্বাস্তু হবে বাংলাদেশের মানুষ।

গত ২৬শে আগস্ট দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং ফুলবাড়ী সম্মিলিত পেশাজীবী সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, এসব পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আবহাওয়া পরিবর্তনের ভয়াবহ বিপদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যার ফলে করোনা মহামারির মতো আরও অনেক মহামারিতে পড়তে হবে এদেশের মানুষকে। সুতরাং অবিলম্বে এসব প্রকল্প বাতিল করতে হবে। তিনি আরও বলেন, লাখ লাখ মানুষের গণআন্দোলনের মাধ্যমে ফুলবাড়ীতে সেদিন যে চুক্তি হয়েছিল, সেই ৬ দফা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হ'লেও লুটেরা কোম্পানীগুলি আবার নাম পাল্টিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের নামে বন, নদী ও পরিবেশ ধ্বংস করে জনবিরোধী কোন প্রকল্প নয়। ফুলবাড়ী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সুন্দরবন আন্দোলন হয়েছে। তাই ফুলবাড়ী চুক্তি নিয়ে আবারও কোন চক্রান্ত করা হ'লে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

করোনাকালে বাড়ছে দাদন ব্যবসায়ীদের দাপট
ঋণের বেড়াজালে নিঃস্ব হচ্ছে হাযারো পরিবার

(১) রাজশাহী যেলার পবা উপযেলার হরিপুর ইউনিয়নের মাঝেরদিয়া গ্রামের হুমায়ূন কবীর। সীমান্ত এলাকার এই যুবক বি.এ পাস করার পর চাকুরী না পেয়ে ঋণ নিয়ে বাইক কিনে মানুষ আনা-নেয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু করোনায় লকডাউনের কারণে মানুষের যাতায়াত কমে যাওয়ায় অনেকদিন ঘরে বসে থাকায় আয় রোজগার বন্ধ ছিল। ফলে ঋণের টাকা দূরের কথা নিয়মিত সূদের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ী মাস্তান দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর জমি বন্ধক রেখে সূদের টাকা পরিশোধ করে। ভুক্তভোগীরা বলেন, পদ্মার চরের সর্বত্রই সূদের ব্যবসা চলছে। আগে গ্রামে কারো ১ থেকে ২ লাখ টাকা হ'লে ধান-পাটের ব্যবসা করত। এখন করে সূদের ব্যবসা। দাদন ব্যবসায়ীরা সূদের হার স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ এবং ব্যক্তির চাহিদার ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করে। ১ হাযার টাকা নিলে সূদের হার এলাকাভেদে মাসিক ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রহীতাদের যদি হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহ'লে সূদের হার বেড়ে যায়। আবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা গ্রামের হাটে পণ্য বেচা-কেনার প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার জন্য দাদনে টাকা নিলে সূদের হার বেড়ে যায়। হাটে পণ্য কেনা-বেচার জন্য কোনো ব্যবসায়ী ১০ হাযার টাকা ঋণ নিলে হাযারে ৩০০ টাকা পর্যন্ত সূদ পরিশোধ করতে হয়।

(২) নওগাঁর মহাদেবপুর উপযেলার অর্জুন গ্রামের আপেল মাহমূদ নামে এক মৎস্যচাষী এক বছর আগে শালগ্রাম এলাকার দাদন ব্যবসায়ী বিপ্লবের কাছ থেকে মাসিক সূদে ৫ লাখ টাকা ঋণ নেয়। প্রতি মাসে বিপ্লবকে শোধ করতে হয় ৩০ হাযার টাকা। আপেল মাহমূদ তার ৫ বিঘা জমি বিক্রি করে সূদে-আসলে ১৫ লাখ টাকা দাদন ব্যবসায়ীকে দিয়েছে।

(৩) জয়পুরহাটের মাদারগঞ্জ বামনপুর মহল্লার রতন কুমার দম্পতি প্রতিবেশী কল্পনা রাণীর কাছ থেকে চড়া সূদে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিল। বাড়তি কোন আয়রোজগার না থাকায় সংসার পরিচালনা ও সূদের টাকা দিতে গিয়ে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। ঋণ পরিশোধ করতে ঐ দম্পতি একে একে ছয়জনের কাছ থেকে আরও ঋণ নেন। পাঁচ বছরের মাথায় ১ লাখ টাকার ঋণ ১১ লাখ টাকায় গিয়ে ঠেকে। ঋণ শোধ করতে গিয়ে গত পাঁচ বছরে পৈতৃক আট বিঘা জমি বিক্রি করেছে রতন। বর্তমানে তাদের ৩ শতক বসতবাড়ি ছাড়া কিছুই নেই এখন। তারা নিঃস্ব হ'লেও এখনো ঋণের টাকা পরিশোধ হয়নি। সূদের ব্যবসায়ীরা তাদের মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁই বসতবাড়িটি এখন দখল করতে চাইছে। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা এখন আশ্রয় নিয়েছে প্রশাসনের।

(৪) নাটোর সদরের বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল। মাত্র ৬০ হাযার টাকা ঋণ নিলে এক বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ লাখে। তার পক্ষে এই টাকা পরিশোধ করা ছিল অসম্ভব। তাই হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করে গোপাল মণ্ডল। তার স্ত্রী জানান, সূদের টাকা চাইতে প্রায়ই বাড়িতে আসতো ঐ দাদন ব্যবসায়ী। টাকা দিতে না পারায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। এর মধ্যেই একদিন তাকে ধরে মারধর করা হয়। এই অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেন গোপাল।

(৫) নাটোরের বড়াইগ্রাম উপযেলার ভ্যান চালক রেযাউল। সে দাদন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চড়া সূদে ৩০ হাযার টাকা ঋণ নেয়। কিছু টাকা পরিশোধ করলেও অল্প দিনেই তা সূদে-আসলে ৮০ হাযার টাকায় দাঁড়ায়। টাকা দিতে না পারায় তারা তার একমাত্র অবলম্বন ভ্যানটি কেড়ে নেয়। তাতেও ঋণ শোধ না হওয়ায় নিরুপায় রেযাউল আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে নিজ স্ত্রীর কাছ থেকে ২২ দিনের শিশু সন্তানকে নিয়ে বিক্রি করে দেয়।

(৬) গাইবান্ধা সদর উপযেলার কয়েকজন দাদন ব্যবসায়ী মৌসুমী ধান বাবদ এবং মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ও হাটরা সূদের ভিত্তিতে সূদের ব্যবসা করে। মাসিক ভিত্তিতে ১০ হাযার টাকায় ১ হাযার টাকা সূদ দিতে হয়। ফলে বার্ষিক সূদের হার দাঁড়ায় ১২০ শতাংশ। এছাড়া 'কারেন্ট' সূদের ওপর নিলে ১ হাযার টাকায় দিনে ১০০ টাকা সূদ দিতে হয়। 'হাটরা'য় প্রতি সপ্তাহে হাটে ১ হাযার টাকায় সূদ দিতে হয় ১৬০ টাকা। কাগজপত্রের ঝামেলা ও হয়রানির কারণে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ নিতে আগ্রহ কম।

করোনার কারণে গত দেড়-দুই বছরে কৃষকদের একটি বড় অংশ গভীর সংকটে পড়েছে। তারা টিকে থাকার জন্য চড়া সূদে ঋণ নিচ্ছে। ফলে আত্মহত্যা, হামলা-মামলা এমনকি খুনের মতো ঘটনাও ঘটছে। ব্যক্তিগতভাবে সূদের কারবারসহ গ্রামে-গঞ্জে নামে-বেনামে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমেও এই সূদের ব্যবসা করছে প্রভাবশালীরা। এসব সূদের ব্যবসায়ীরা রাতারাতি হয়ে যায় বিরাট ধন-সম্পদের মালিক। আর অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

[স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কি সরকার ইসলামী বিধান মেনে দেশ থেকে সূদ নিঃশেষ করবে না? (স.স.)]

বিদেশ

ছেলের খোঁজে ৫ লাখ কিলোমিটার!

চীনের শানডং প্রদেশ। ১৯৯৭ সালের কোন একদিন। বাড়ির সামনে খেলছিল দুই বছরের এক শিশু। এ সময় মানব পাচারকারীরা শিশুটিকে অপহরণ করে। এই ঘটনায় পিতা জো গ্যাংট্যাং তো পাগলপ্রায়। ছেলের খোঁজে তিনি মোটর সাইকেলে পুরো দেশ চষে বেড়ান। এজন্য তিনি ৫ লাখ কিলোমিটারের বেশি পথ ভ্রমণ করেন। তবে তাঁর সেই শ্রম বৃথা যায়নি। ২৪ বছর খোঁজাখুঁজির পর গ্যাংট্যাং তাঁর ছেলেকে খুঁজে পেয়েছেন। তবে শিশুটি তখন পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে।

দেশটির জননিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে গ্যাংট্যাংয়ের ছেলের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর অপহরণের ঘটনায় জড়িত এক দম্পতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্যাংট্যাং বলেন, ছেলেকে পাওয়া গেছে এতেই তিনি খুশি। তবে ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাকে জীবনের একটি বড় সময় ব্যয় করতে হয়েছে। এজন্য তিনি মোটরসাইকেলে ছেলের ছবিসহ একটি ব্যানার নিয়ে ২০টি প্রদেশ ভ্রমণ করেন। সফরকালে কয়েকবার সড়ক দুর্ঘটনা সহ তার মোট ১০টি মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তালেবানের হাতে ৮৫ হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র দিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র

-কংগ্রেস সদস্য জিম ব্যাঙ্কস

মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান ত্যাগ করার সময় ফেলে গেছে ৮৫ হাযার কোটি ডলারের অত্যাধুনিক অস্ত্র, সামরিক যানবাহন ও সরঞ্জাম, যা এখন তালেবানদের দখলে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য জিম ব্যাঙ্কস বলেছেন, তালেবানের কাছে ৭৫ হাযার গাড়ি, ৬০ হাযার ছোট ও হালকা অস্ত্র এবং ২শ' হেলিকপ্টার এবং বিমানসহ প্রায় ৮৫ হাযার কোটি ডলারের জিনিস আফগানিস্তানে ফেলে এসেছে মার্কিন বাহিনী। ব্যাঙ্কস বলেছেন যে, তার দাবীগুলো সঠিক। কারণ আফগানিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কস বলেন, 'প্রশাসনের গাফিলতির জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বহু সংখ্যক ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার এখন তালেবানদের দখলে। পৃথিবীর ৮৫ শতাংশের বেশী দেশের হাতে যে সংখ্যায় এ বিশেষ হেলিকপ্টার আছে, তার থেকে বেশী আছে তালেবানের হাতে'। তিনি বলেন, 'শরীরের বর্ম, নাইট-ভিশন গগলস এবং চিকিৎসা সামগ্রীর মতো সরঞ্জামও জব্দ করেছে তালেবানরা'। ফলে এখন তালেবানদের আর আগের মতো একে-৪৭ হাতে দেখা যাচ্ছে না। এখন তারা হামভি যান চালাচ্ছে এবং মার্কিন তৈরী এম ১৬ রাইফেল নিয়ে ঘুরছে।

আফগানিস্তানে আমেরিকা শুধু অস্ত্র দেওয়া নয়, আফগান বাহিনীর বিভিন্ন অংশকে অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণও দিয়েছে। অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন অনেক অস্ত্র আফগানিস্তানে রয়েছে, যেগুলিকে চালানোর ক্ষমতা তালেবানের নেই। যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত লজিস্টিক সাপোর্ট ছাড়া এই ধরনের অস্ত্র চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণা করেছে তালেবান

গত ১৫ই আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল এবং দেশটিকে 'ইসলামিক আমিরাত' ঘোষণা করার পর এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেছে তালেবান। গত ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ঘোষিত এই নতুন সরকারে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান করা হয়েছে তালেবানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দকে। তার উপ-প্রধান হিসাবে কাজ করবেন তালেবানের সহপ্রতিষ্ঠাতা মোল্লা আব্দুল গনী বারাদার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করবেন তালেবানের সামরিক কমিশনের প্রধান মোল্লা ইয়াকূব। যিনি মোল্লা ওমরের পুত্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন হাক্কানী নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সোভিয়েত বিরোধী লড়াইয়ের মুজাহিদ নেতা জালালুদ্দীন হাক্কানীর পুত্র নেটওয়ার্কটির বর্তমান প্রধান সিরাজুদ্দীন হাক্কানী। এছাড়া 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ)' বিষয়ক একজন মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে তালেবান। যাঁর নাম মোল্লা মুহাম্মাদ খালিদ। রাজধানী কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে তালেবান মুখপাত্র যবীহুল্লাহ মুজাহিদ নতুন সরকারের মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেছেন।

তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হায়বাতুল্লাহ আখুন্দযাদা এরই মধ্যে নতুন সরকারকে ইসলামিক নিয়মনীতি এবং শরী'আ আইন সমুন্নত রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। সাথে সাথে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে যারা আছেন, তাদেরকে দেশের স্বার্থ সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা এবং দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া আরেক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এখন থেকে আফগানিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সব বিষয় ও সিদ্ধান্ত ইসলামী শরী'আ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, তালেবান বাহিনীতে আখুন্দযাদা 'আমীরুল মুমিনীন' হিসাবে পরিচিত। রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় যে কোনও বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার অধীনেই নতুন সরকার পরিচালিত হবে।

হায়বাতুল্লাহ আখুন্দযাদা সামরিক কমাণ্ডারের তুলনায় একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবেই বেশি পরিচিত। আশির দশকে তিনি সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন এবং নব্বইয়ের দশকে শরী'আহ আদালতের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কান্দাহারের বাসিন্দা মোল্লা হাসান সাবেক তালেবান সরকারেও (১৯৯৬-২০০১) পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনিও সামরিক নেতা হিসাবে নয় বরং ধর্মীয় নেতা হিসাবে বেশি পরিচিত এবং তিনি তালেবানের আধ্যাত্মিক নেতা হায়বাতুল্লাহ আখুন্দযাদার অতি ঘনিষ্ঠজন বলে জানা যায়।

মোল্লা আব্দুল গনী বারাদার কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের চেয়ারম্যান। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই বারাদারের লড়াইয়ের হাতেখড়ি। ২০১০ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানে কারান্তরীণ ছিলেন। কিন্তু ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে আলোচনা গতিশীল করতে ওয়াশিংটনের চাওয়ায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০২০ সালে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের দোহা চুক্তিতে তালেবানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ইয়াকূব তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের ছেলে। মোল্লা হায়বাতুল্লাহর ছাত্রও ছিলেন তিনি। তিনি তালেবানের সামরিক কমিশনের প্রধান হিসাবে ইয়াকূবকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের কৌশল ঠিক করা ও অভিযান পরিচালনা করা তার কাজের অন্যতম অংশ। বাহিনীতে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র অনেকটা তাঁর প্রয়াত পিতার কারণে। যে কারণে দলে বিভেদ কিংবা কোন্দলের সময় ঐক্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান তিনি।

তালেবানের নতুন সরকার ঘোষণায় মন্ত্রীসভায় এখনো পর্যন্ত কোন নারীমুখ দেখা যায়নি। যদিও তালেবান নেতারা বলেছেন, আফগান সমাজে নারীদের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তারা শিক্ষাও নিতে

পারবে। তবে তাদের ঘরে থাকা উচিৎ। তবে দলটির আরেক মুখপাত্র সাঈদ জাফরুল্লাহ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নারীরা মন্ত্রী হ'তে পারবে না। আফগান নারী তারাই, যারা সন্তান জন্ম দিবে এবং তাদেরকে শারঈ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে।

তালেবানদের প্রশংসায় মার্কিন সেনা কর্মকর্তা

আফগানিস্তানে গত ১৫ই আগস্ট থেকে যেসব মার্কিন নাগরিক কাবুল বিমানবন্দরে গেছেন, তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে তালেবান যোদ্ধারা। এ নিয়ে তালেবানদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা। বার্তা সংস্থা সিএনএন জানায়, পশ্চিমা দেশগুলো যখন ৩১শে আগস্টের আগে আফগান ছাড়তে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছিল, তখন আইএস- খোরাসানের হুমকির মধ্যে কাবুল বিমানবন্দর পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে তালেবান যোদ্ধারা মার্কিন সাধারণ নাগরিকদের কাবুল বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

এ ঘটনার প্রশংসা করে মার্কিন ওই সেনা কর্মকর্তা বলেন, এটা অত্যন্ত বিরল এবং সুন্দর ঘটনা। গত ২০ বছর ধরে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি। কিন্তু তারা বেশ গোছালোভাবেই কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কাবুল বিমানবন্দর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে। এতে তাদের মানবিক মূল্যবোধ খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আফিম চাষ বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে তালেবান

আফগানিস্তানে আফিম চাষ বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে তালেবান। সম্প্রতি রাজধানী কাবুল দখলের মাধ্যমে পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর যখন আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে তখন এই উদ্যোগ নিল তালেবান। এরই মধ্যে তালেবান নেতারা স্থানীয় চাষীদের আফিম চাষ বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া গত ১৮ই আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনেও তালেবান মুখপাত্র যবীহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছিলেন, দেশের নতুন শাসকরা মাদক ব্যবসার অনুমতি দেবেন না। তবে কবে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তালেবানের এই উদ্যোগে আফগানিস্তানজুড়ে কাঁচা আফিমের দাম বেড়ে গেছে। আগে প্রতি কেজি কাঁচা আফিম বিক্রি হ'ত ৭০ ডলারে, বর্তমানে দাম বেড়ে তা ২০০ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। উল্লেখ্য, কাঁচা আফিমকে প্রক্রিয়াজাত করে হেরোইন তৈরী করা হয়। আর আফগানিস্তান হ'ল বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ আফিম উৎপাদনকারী দেশ।

তালেবানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আফগান ফেরত ভারতীয় শিক্ষক

তালেবানের হাতে আফগানিস্তানের পতন হওয়ার পর ফিরে আসা ভারতীয়দের মধ্যে তমাল ভট্টাচার্য নামের এক প্রবাসী শিক্ষক তালেবান নিয়ে ভিন্ন গল্প শুনিয়েছেন। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখানকার গোটা পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তালেবানদের। তিনি বলেন, কাবুল দখলের পর তালেবানরা প্রথমে এসেই আমাদের বলল স্যার চিন্তা করবেন না; ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের সঠিক নিরাপত্তা দেব যেন কোন তৃতীয় পক্ষ আপনাদের মেরে ফেলতে না পারে।

তিনি বলেন, 'ওরা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যত শিক্ষক ছিলেন সবাইকে এক জায়গায় রাখল। তারা আমাদের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছিল। আমাদের তারা যথেষ্ট ভরসা যুগিয়েছে। তারা বলেছে, কুরআনে শিক্ষকদের উচ্চমর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাই আমরা আপনাদের সম্মান করব। ফলে তারা আমাদের রাতে পাহারা দিয়েছে। মেয়েদেরও সব ধরনের সাহায্য করেছে তারা। আমাদের সবার মধ্যে নানা আশংকা ছিল। কিন্তু তারা তাদের ব্যবহার দিয়ে আমাদের চিন্তা বদলে দিয়েছে।

তিনি বলেন, তালেবানরা ধর্মপরায়ণ মানুষ। তাদের মতে কোন মানুষকে ঠকানো যাবে না। ফলে অনেক ধরনের আইন ইতিমধ্যে বদলে গেছে। আমরা আগে যে কাবাব খেতাম ১৫০ টাকায়, সেই কাবাবে এখন গোশতের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

শিক্ষার সর্বস্তরে সহ-শিক্ষা নিষিদ্ধ করল তালেবান

আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে তালেবান সরকার। এ নীতিমালা অনুযায়ী নারীরা আগের মতই শিক্ষার সুযোগ পাবে। তবে শারঈ বিধান অনুযায়ী প্রাইমারী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রীদেরকে বাধ্যতামূলক বোরক্বা পরতে হবে। ছাত্রীদেরকে নারী শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান করা হবে। তালেবান সরকারের নতুন শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল বাক্বী হাক্কানী এসব নীতির কথা তুলে ধরেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা সহ-শিক্ষার অনুমোদন দিব না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক করা হবে। এদেশের মানুষ মুসলিম। তারা এটা মেনে নেবে। তিনি বলেন, যেখানে মহিলা শিক্ষক নেই সেখানে বিকল্প খোঁজা হবে। যেমন পুরুষ শিক্ষকরা একটি পর্দার পেছন থেকে শিক্ষাদান করতে পারেন অথবা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের প্রচুর সংখ্যক নারী শিক্ষিকা রয়েছে, যারা ছাত্রীদেরকে আলাদাভাবে পাঠদান করতে পারবেন। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করা হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবান যখন ক্ষমতায় ছিল তখন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানি তৈরির রোবট বানিয়ে তাক লাগালেন মিসরীয় প্রকৌশলী

পানিই জীবন। পৃথিবীর বাইরে বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজে বের করার পক্ষে একটাই শর্ত পানি। এক্ষেত্রে সুখবর নিয়ে এল রোবট 'উখট'। বাতাসের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে যে কোন গ্রহে হাযার হাযার লিটার পানি জমা করতে সক্ষম রোবট তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মিসরের তরুণ প্রকৌশলী মাহমূদ আল-কেমী।

বর্তমানে লালগ্রহে অনেক বেশী আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করলেও অতিরিক্ত বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কারণে সেখানে তরল পানি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে রয়েছে বরফ। পৃথিবীর কাছাকাছি বসবাসের বিকল্প গ্রহের সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরেই মঙ্গলে প্রাণ ও পানির অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মঙ্গলগ্রহের অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়েই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে 'উখট' রোবট তৈরি করেন মাহমূদ।

প্রকৌশলী মাহমূদ আল-কেমি বলেন, উখট-তে এমন এক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যা বাতাসের আর্দ্রতা থেকে পানিকে আলাদা করতে পারে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঙ্গলের উচ্চ আর্দ্রতার অঞ্চলে গিয়ে বিশুদ্ধ পানি উৎপাদনে সক্ষম। লাল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য এটি বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

এভাবে উখট কম খরচে দৈনিক ৫ হাযার লিটারের বেশী পানি জমা করতে পারে বলে দাবী করেছেন এর প্রস্তুতকারক। রোবটটি ব্যবহারে এক লিটার পানি উৎপাদনের খরচ মাত্র ৩ থেকে ৪ টাকা। যেখানে অন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই কাজ করতে প্রায় ২০ গুণ বেশী অর্থ খরচ হয়

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সেশন কর্মী সম্মেলন ২০১৯-২১

৯ ও ১০ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার

দুনিয়াবী স্বার্থে নয়, পরকালীন স্থায়ী শান্তির আশায় কাজ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা.) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ২০১৯-২১ সেশন কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্মীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা শূরার ২০ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, যারা দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে তারা স্রেফ দুনিয়া পায় আখেরাত হারায়। যারা দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই পায়। আর যারা দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারায়।

আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ ও বিদ'আতীদের মধ্যে পার্থক্য শুধু রাফউল ইয়াদায়েন ও আমীন বলা নয়। বরং যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান যারা মেনে চলবেন তারাই আহলেহাদীছ। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি, ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের দারস দেওয়া আহলেহাদীছ শিক্ষকরাও চল্লিশা ও কুলখানীসহ বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেন। আমাদের দাওয়াত ও সাংগঠনিক তৎপরতায় যা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আপনাদেরকে দাওয়াতী ময়দানে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন সার্বিক জীবনে ইসলামের বিধান পালনের আন্দোলন। এর ইতিহাস মানুষের রচিত ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিধান সমূহ থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ ইসলামের দিকে ফিরে আসার ইতিহাস। যে বিষয়ে পাশ্চাত্যের অমুসলিম বিদ্বানগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস ইখলাছ ও ত্যাগের ইতিহাস। মাত্র ১ টাকা মাসিক এয়ানত দিয়ে আমরা ছাত্ররা 'যুবসংঘে'র নামে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছিলাম। আজ দাওয়াত ও সংগঠন দেশব্যাপী এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রসার লাভ করেছে। এসবই ত্যাগের ও ইখলাছের দুনিয়াবী ফসল। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, হকের দাওয়াত দিলে বাধা অবশ্যম্ভাবী। সর্বোচ্চ বাধা রাজনৈতিক বাধা। যে পরীক্ষাও আমাদের জীবনে হয়ে গেছে। দশ দশটি মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাবন্দী করেছিল কথিত ইসলামী মূল্যবোধের চারদলীয় জোট সরকার। আমরা বিচার দিয়েছিলাম আল্লাহ্র কাছে। বিচার তিনি করেছেন। তারা বলেছিল, We want him at least 14 years to let this movement die down. 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে নিঃশেষ হয়ে যায়'। কিন্তু না আমরা বা আমাদের আন্দোলন মরেনি। বরং আরও বেড়েছে ও আরও বেগবান হয়েছে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে। তবে তারা আমাদের জীবন থেকে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং হাজতের নামে কারা নির্যাতন করেছে। অতঃপর ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন মিথ্যা মামলার বোঝা বইতে বাধ্য করেছে। তাই আসুন! আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকল বাধা অতিক্রম করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাই।

১ম দিন বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমানের অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। এরপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের (জয়পুরহাট) জাগরণী পরিবেশন করে। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

অতঃপর আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে 'সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। অতঃপর 'সমাজ সংস্কারে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)।

অতঃপর বাদ মাগরিব 'ইহতিসাব রাখার গুরুত্ব ও পদ্ধতি' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী), 'সমাজের আক্বীদা সংস্কারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অবদান' বিষয়ে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'তাযকিয়া ও তারবিয়াহ্র দু'টি মাধ্যম পর্যালোচনা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায)।

তারপর সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখার পক্ষ থেকে জনাব ইমরান মোল্লা (রিয়াদ), চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইন, নওগাঁ যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

অতঃপর বাদ এশা বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বগুড়া যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন ও সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর দরসে কুরআন পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি সূরা হাশরের ৭ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আমাদের সার্বিক জীবনে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর নির্দেশ মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কার্যকর। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। আহলেহাদীছ আন্দোলনও তাই। অতঃপর তিনি ভারতের বিখ্যাত হানাফী মনীষী আবুল হাসান আলী নাদভীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন ৪টি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিশীল। (১) তাওহীদ (২) ইত্তেবায়ে সুন্নাত (৩) জিহাদী জাযবা ও (৪) আল্লাহ্র নিকট বিনীত হওয়া। আমাদের মধ্যেও যেন উক্ত ৪টি বৈশিষ্ট্য সর্বদা বিদ্যমান থাকে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছদের মধ্যে এখন দু'টি পার্থক্য রেখা ফুটে উঠেছে। একদল জাতীয়তাবাদী আহলেহাদীছ ও আরেকদল বিশুদ্ধতাবাদী বা সংস্কারপন্থী আহলেহাদীছ। আমরা নিঃসন্দেহে সংস্কারবাদী এবং সার্বিকভাবে সমাজ সংস্কারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আপনাদের প্রতি পদক্ষেপে যেন সংস্কারের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

আমীরে জামা'আতের দরসের পর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, (২) 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব পর্যালোচনা' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৩) 'আদর্শ সোনামণি গঠনে অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম (মারকায), (৪) 'সংগঠনের অগ্রগতিতে মাসিক সফর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব' বিষয়ে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, (৫) 'গঠনতন্ত্রের ধারা-১৬ পর্যালোচনা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), (৬) 'দ্বিতীয় দফা মূলনীতি অনুসরণের গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) এবং (৭) 'আল-'আওনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায) প্রমুখ।

নাশতার বিরতির পর (৮) 'আহলুলহাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায), (৯) 'গঠনতন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ধারা-৩ ও ৪ ব্যাখ্যা' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (১০) 'কর্মীদের মান বৃদ্ধিতে 'কর্মপদ্ধতি'র তৃতীয় দফা বাস্তবায়নের গুরুত্ব' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায), (১১) 'সংগঠনের মযবূতীর জন্য নিয়মিত কর্মী যোগাযোগের গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), এবং (১২) 'আন্দোলন'-এর অগ্রগতিতে 'থিসিস' পাঠের গুরুত্ব' বিষয়ে সম্মানিত অতিথি বক্তা হিসাবে ভাষণ পেশ করেন আমেরিকার লুজিয়ানা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর ড. শহীদ নক্বীব ভূঁইয়া (ঢাকা)। অতঃপর ২০২১-২৩ সেশনের মজলিসে আমেলা, শূরা, যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর আমীরে জামা'আত তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিসে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম-এর পরিচালনায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সভাপতির নির্দেশক্রমে ২০১৯-২০২১ বর্ষের কেন্দ্রের দ্বি-বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এরপর সংগঠনের কেন্দ্রীয় সার্বিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ। এ সময় রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ৯৪ বছর বয়স্ক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব জনাব ডা. ইদ্রীস আলী অসুস্থ শরীর নিয়ে কষ্ট করে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ সকলের নিকট দো'আ চান। অতঃপর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কর্মী সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট ১০ দফা দাবী পেশ করে প্রস্তাবনা পেশ করেন। যা সমস্বরে গৃহীত হয়। এই সময় ঢাকা থেকে সম্মানিত মেহমান প্রফেসর ড. শহীদ নক্বীব ভূঁইয়া আগমন করেন ও সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফেয লুৎফুর রহমান (মারকায), হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম ও ইয়াকূব হোসাইন (মেহেরপুর) প্রমুখ।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সম্মেলনে ৫৮টি যেলা থেকে ১১০১ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত হন।

জুম'আর খুৎবা : খুৎবায় সূরা নিসার ৬৫ আয়াত উদ্ধৃত করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এই আয়াত সহ সূরা মায়েদার ৪৪-৪৫ ও ৪৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় খারেজী আক্বীদাপুষ্ট মুফাসসিরদের ভুল তাফসীরে প্রভাবিত হয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে দেশের অনেক তরুণ চরমপন্থী ও জঙ্গীবাদী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমাদের সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী এই ধাঁধাঁ থেকে মুক্ত এবং এর বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদী সংগঠন হিসাবে জ্ঞানী মহলে সমাদৃত। তিনি বলেন, অন্যান্য দলের লক্ষ্য স্ব স্ব দলকে বিজয়ী করা। আর আমাদের লক্ষ্য হ'ল, সার্বিক জীবনে কুরআন-হাদীছকে বিজয়ী করা। আমাদের লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তন করা এবং দল-মত নির্বিশেষে সকল বনু আদমের নিকট কুরআন-হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। অতঃপর তিনি সমাজের মদ-জুয়া, সূদ-ঘুষ, বেপর্দা-বেহায়াপনা ও নারী নির্যাতনের ব্যাপকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি সেশন কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ : কর্মী সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়- (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ

হাদীছের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। (২) জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সহ শিক্ষার বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে। (৩) মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছবি-মূর্তি টাঙানো ও শহীদ মিনার স্থাপনের বাধ্যবাধ্যকতা প্রত্যাহার করতে হবে। (৪) স্কুল-মাদরাসার পাঠ্য বই সমূহ থেকে ঈমান-আক্বীদা বিরোধী সবকিছু প্রত্যাহার করতে হবে। (৫) সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে এবং 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মনোনীত প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৬) ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল করতে হবে। সাথে সাথে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করা এবং মহিলাদের পর্দা পালনে বাধাসৃষ্টিকারীদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। (৭) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মদ-জুয়ার অবাধ সয়লাব রোধ এবং বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে টিভি-সিনেমা ও পত্র-পত্রিকা থেকে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মাসিক আত-তাহরীক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভিসহ অন্যান্য সুস্থ গণমাধ্যমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে হবে। (৮) এ সম্মেলন খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিদানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের ইসলাম বিরোধী শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে 'হিল্লা প্রথা' বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে। (৯) এ সম্মেলন আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মহলবিশেষের আক্রমণাত্মক অবস্থানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের নিরপেক্ষ ও সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করছে। (১০) এ সম্মেলন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অথবা তাদের আবাসভূমি রাখাইন প্রদেশকে স্বাধীন 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণার জন্য জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং : সম্মেলন উপলক্ষে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর আবাসিক ভবনের ডাইনিং হলের সামনে ২নং স্টলে আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, তথ্য সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ৩২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৮ জন ডোনর বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় আল-'আওনের শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর ১৬ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আ. ন. ম বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুয্যামান।

মাসিক ইজতেমা

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পতেঙ্গা থানাধীন হোসেন আহমাদ পাড়াস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন সাব্বির। উল্লেখ্য, মাসিক ইজতেমার পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমান উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আলোচনা সভা

তকিপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৬শে জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন তকিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার এস. এম সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ।

কোয়ালীপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৮শে জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন কোয়ালীপাড়া উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরদাশ এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার মানছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন নরদাশ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম।

হরিয়ান নগর, মণিরামপুর, যশোর ৬ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন হরিয়ান নগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আ. ন. ম বযলুর রশীদ ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, আলোচনা সভার পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

তা'লীমী বৈঠক

সাধুরমোড়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী ১১ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের বোয়ালিয়া থানাধীন সাধুর মোড় মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রবীন লেখক মৃত আলহাজ্জ আব্দুর রহমানের বড় পুত্র মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকা প্রবাসী মাহফূযুর রহমানের বাসায় তার সভাপতিত্বে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুহাম্মাদ ক্বারী।

কোমরপুর, পাবনা ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কোমরপুর হযরত আলী (রাঃ) জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সদর থানা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলযারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ শাহীন ও শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদত হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের পরিচালক রবীউল ইসলাম।

মহিলা সমাবেশ

দুর্বাডাঙ্গা, মণিরামপুর, যশোর ৮ই আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন দুর্বাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র সভানেত্রী তহূরুন নেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে আদর্শ পরিবার গঠনে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র গুরুত্ব তুলে ধরেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন।

যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১

৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টা থেকে যোহর পর্যন্ত রাজশাহী নওদাপাড়ায় দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা.) জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায)। এরপর যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন (১) 'দাওয়াতী কার্যক্রম বৃদ্ধির উপায়' বিষয়ে পিরোজপুর যেলা সভাপতি আবু নাঈম ও (২) সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি নাজমুল হোসাইন। (৩) 'সাংগঠনিক মযবূতীর উপায়' বিষয়ে রাজশাহী সদর যেলা সভাপতি ফায়ছাল মাহমূদ ও (৪) ময়মনসিংহ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলী। (৫) 'দায়িত্বশীলদের কর্তব্য' বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও (৬) গাযীপুর যেলা সভাপতি শরীফুল ইসলাম। (৭) 'যুবসংঘে'র সংস্কার তৎপরতা সমূহ' বিষয়ে দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম ও (৮) কুমিল্লা যেলা সভাপতি আব্দুস সাত্তার এবং (৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা' বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী মামূন বিন হাশমত (কুষ্টিয়া)।

অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে (১) 'সমাজসেবায় 'যুবসংঘে'র ভূমিকা ও করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা), (২) 'আমানতদারিতা এবং সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি' বিষয়ে অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী), (৩) 'শিক্ষাঙ্গনে যুবসংঘ' বিষয়ে ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর (দিনাজপুর), (৪) 'কর্মী মানোন্নয়নে মানোন্নয়ন সিলেবাস' বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), (৫) 'কর্মপদ্ধতির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি' বিষয়ে প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন (ঝিনাইদহ), (৬) 'ইক্বামতে দ্বীন : বিভ্রান্তি নিরসন' বিষয়ে সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী), (৭) 'কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

অতঃপর অতিথিদের বক্তব্যে (১) 'সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির উপায়' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ (রাজশাহী), (২) 'গঠনতন্ত্র অনুসরণের গুরুত্ব' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৩) 'কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আক্বীদা নির্মূলে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), (৪) 'কর্মীদের ইলমী দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব' বিষয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (৫) 'যুবসমাজের সমসাময়িক সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) এবং (৬) 'সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায)। (৭) তারপর কর্মীদের প্রতি নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, (৮) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) ও (৯) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর কর্মীদের শপথ নেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সূরা আলে ইমরানের ১১০ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান। যারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজের নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা আমল করে না, তারা দ্বিমুখী নীতির অধিকারী। এ থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

তিনি বলেন, 'সাত শ্রেণীর মানুষ ক্বিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহ্র ছায়ার নীচে ছায়া পাবে। তার মধ্যে একশ্রেণী হ'ল ঐ যুবক যারা আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে' *(বুখারী হা/৬৬০)*। এখানে যুবকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা যুবকরাই সমাজের মূল চালিকাশক্তি। তারা যদি সৎকর্মশীল হয়, তাহ'লে সমাজে অন্যায় কর্ম হ'তে পারে না। আর তারা যদি অন্যায় পথে পরিচালিত হয়, তাহ'লে দেশ ও জাতি টিকবে না। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার মত যুবকদের দৃঢ়তায় বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আড়াই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। সেদিনের সেই বিজয়ের ফলে পুরা মধ্যপ্রাচ্য আজকে মুসলিম। আমরা ঐসব তেজোদীপ্ত যুবকদের খুঁজে বের করার জন্যই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছি। ভীরু কাপুরুষ ও চরিত্রহীনদের দিয়ে কিছুই হবে না। শয়তান তোমাদের ধ্বংস করার জন্য চারিদিক থেকে লেগে আছে। তাই শয়তানের খপ্পর থেকে সাবধান!

তিনি বলেন, তোমরা বেলায়েত আলীর দাওয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তিনি কোথাও বের হ'লে গন্তব্যস্থল পৌঁছতে দুই থেকে আড়াই মাস লেগে যেত। রাস্তায় পথিক, কৃষক, দোকানদার

যাকেই পেতেন, তাকেই দাওয়াত দিতেন। অতঃপর তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমার আব্বা মাওলানা আহমাদ আলী জোঁকের কামড় খেয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বলেই সাতক্ষীরার আশাশুনি উপযেলা ও বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে কালাবগী-সুতারখালী গ্রামগুলি এখন আহলেহাদীছ। তাই তোমাদের দ্বারা একজনও হেদায়াত পেলে সেটাই তোমাদের জান্নাতের অসীলা হবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

সোনামণি

বিশ্বনাথপুর, গোড়াগাড়ী ২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন বিশ্বনাথপুর দারুসসুন্নাহ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার ও প্রধান শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল মালেক ও ইসলামী জাগরণী পেশ করে তাওফীকুল ইসলাম।

খলীলপুর, সুজানগর, পাবনা ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সুজানগর উপযেলাধীন দারুল হাদীছ মডেল মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কাতার শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আব্দুল কাবীর। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান প্রশিক্ষণের পূর্বে উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আল-'আওন

ষষ্ঠীতলা, যশোর ২০শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের ষষ্ঠীতলাস্থ আল্লাহ্র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা আল-'আওনে'র কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠান শেষে আবীদ হাসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা আল-'আওনের ২০২১-২২ সেশনের ৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩২ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় ও ৫০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

কমিটি পুনর্গঠন

'আল-আওন' ২০২১-২২ সেশন-এর জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

যেলার নাম	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
সাতক্ষীরা	মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান	কামাল হোসাইন
ঝিনাইদহ	বেলাল হোসাইন	মুহাম্মাদ ফয়ছাল কবীর
নওগাঁ	ডা. শাহীনুর রহমান	মীযানুর রহমান
রংপুর	মশিউর বিন মাহতাব	লুৎফর রহমান
নীলফামারী	ফযলুল হক	মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
পঞ্চগড়	শামীম প্রধান	মাযহারুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও	মুয্যাম্মেল হক	মুকাররম হোসাইন মুন্না
নরসিংদী	আব্দুস সাত্তার	মনযূর হোসাইন
নারায়ণগঞ্জ	ডা. নাঈম	আযীযুল ইসলাম
পাবনা	ইকবাল বিন জিন্নাহ	সোহেল রানা
গাযীপুর	আলম হোসাইন	মাহবূব ইসলাম

উক্ত যেলাসমূহ সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. জাহিদ, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডা. শাহীনুর রহমান ও দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উপদেষ্টা ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (৭৪) গত ২৪শে জুলাই শনিবার দুপুর পৌনে ১-টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ৬ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। তার লাশ এ্যাম্বুলেন্সে সাতক্ষীরার বাঁকালস্থ দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স ময়দানে আনা হয় এবং ঐদিন বিকাল ৬-টায় তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। পরদিন তার নিজগ্রাম খুলনা যেলার ডুমুরিয়া থানাধীন বরুনায় দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মালয়েশিয়ার সভাপতি মুহাম্মাদ যাকারিয়া মিঞা (৫৪) গত ৩রা আগস্ট মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯-টায় মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের চুংগাইব্লুহ হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ যাকারিয়া মিঞা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সবুজবাগ থানার মানিকদিয়া ইউনিয়নের বাইকদিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মালয়েশিয়ার ২০১৯-২০২১ সেশনের সভাপতি ছিলেন। গত ১০ই আগস্ট ২০২০ তারিখে কমিটি গঠিত হওয়ার পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মালয়েশিয়ার সভাপতি মনোনীত হয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : স্কুলে শিক্ষকতার কারণে বাধ্যগতভাবে বিভিন্ন দিবস পালন অনুষ্ঠানে যেতে হয়। জেনে-শুনে চাকুরী বাঁচানোর স্বার্থে এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিলে পাপ হবে কি?

-তাওফীক আব্দুল্লাহ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইসলামে দিবস পালনের কোন বিধান নেই। এগুলো বিজাতীয় রীতি হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয়েছে। আর যেগুলো ইসলাম সমর্থন করে না, সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা যাবে না *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অতএব সাধ্যমত এধরনের বিজাতীয় অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। যদি বাধ্যগত অবস্থায় অংশগ্রহণ করতেই হয়, তবে অন্তরে ঘৃণা রাখবে। সরকার বাধ্য করলে এর দায়ভার ও পাপ বহন করবে সরকারই। আল্লাহ বলেন, 'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার কোন চিন্তা নেই)' *(নাহল ১৬/১০৬)*। ইবনু কাছীর বলেন, সাধ্যমত ঈমানের উপর টিকে থাকাই মৌলিক কর্তব্য। তবে বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুফরীতে বাধ্য করা হ'লে বাধ্যকারীর কথামত কাজ করা জায়েয *(ইবনু কাছীর)*। সর্বোপরি সুযোগ থাকলে ভিন্ন কোন পেশা অবলম্বন করাই নিরাপদ ও উত্তম।

প্রশ্ন (২/২) : মেয়ের পিতা বিবাহে রাযী ছিলেন। কিন্তু ছেলের বাড়ি-ঘর দেখার পর তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মেয়ের সিদ্ধান্তের উপর বিবাহের বিষয়টি ছেড়ে দেন। তারপর আমরা কাযী অফিসে দুই বন্ধুর সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ করে একত্রে বসবাস করছি। আমাদের বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে?

-আসাদুল্লাহ, বরিশাল।

উত্তর : বিবাহের উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ পিতা মেয়ের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিলেও তিনি বিবাহে অলীর ভূমিকা পালন করেননি বা কাউকে অলীর দায়িত্ব প্রদান করেননি। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে, তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১ ও ৩১৩০; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯; ইরওয়া হা/১৮৪০)*। এক্ষণে সঠিক নিয়মে পিতার অনুমতিতে ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে নতুনভাবে বিবাহ করা কর্তব্য *(মুগনী ৭/৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : মসজিদে জমি দান করার ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে না রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে? দান করার পর উৎপাদিত ফসল মসজিদ কমিটিকে দিব না সবকিছু মসজিদ কমিটির দায়িত্বে ছেড়ে দিতে হবে? এক মসজিদে দানকৃত জমির আয় অন্য মসজিদে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুন নূর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : মৌখিকভাবে মসজিদে দান করলেই দান কার্যকর হয়ে যাবে। তবে লিখিত বা প্রচলিত রেজিস্ট্রি পদ্ধতি গ্রহণ করা যরূরী, যাতে কোন অস্পষ্টতার সুযোগ না থাকে। আর দান করার পর উক্ত জমিদাতা নিজে আবাদ করে উৎপাদিত ফসল দেয়ার পরিবর্তে পুরো মালিকানা মসজিদ কমিটির হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। সেক্ষেত্রে মসজিদ কমিটি যার মাধ্যমে ইচ্ছা তাকে দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে নিবে। অন্যথায় পরবর্তী ওয়ারিছদের কেউ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। আর এক মসজিদের অতিরিক্ত সম্পদ অন্য মসজিদে দান করায় কোন বাধা নেই *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ৫/৩২২; মুগনী ৬/৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/১৮, ২০৬-২০৭)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'এক্বামত হ'লে আমরা ওযূ করতাম এবং ওযূ শেষে ছালাতের জন্য বের হ'তাম' হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি সুনান আবুদাঊদে বর্ণিত হয়েছে হাসান সূত্রে *(হা/৫১০)*। হাদীছের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, কতিপয় ছাহাবী এক্বামতের পর ওযূ করতেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সকল ছাহাবী এক্বামতের পর ওযূ করতেন। বরং ইবনু ওমর (রাঃ) এটা এজন্য উল্লেখ করেছেন যেন মানুষ বুঝতে পারে এটা জায়েয *(ইবনু রাসলান, শরহ আবুদাঊদ ৩/৪৪২)*। তবে এটা তাদের নিয়মিত আমল নয়। কেননা অন্যান্য হাদীছে ছালাতে অগ্রগামীদের জন্য বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭)*। সিন্ধী বলেন, হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, ছাহাবীদের কেউ কেউ কখনো এক্বামতের পর ওযূ করার জন্য বের হ'তেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) ক্বিরাআত লম্বা হওয়ার কারণে তারা জামা'আত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন *(হাশিয়াতুস সিন্ধী 'আলা সুনানিন নাসাঈ ২/২১)*। মুখতার শানক্বীতী বলেন, ব্যস্ততার কারণে তারা মাঝে-মধ্যে এমনটা করতেন। যারা এরূপ করতেন তাদের বাড়ি ছিল মসজিদের খুব কাছে। কারণ অধিকাংশ ছাহাবী ইক্বামতের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করতেন *(শরহ সুনান নাসাঈ ৪/১৩৭১)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজন পাগল হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হয়ে যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পাগল হওয়া তালাক কার্যকর হওয়ার কোন কারণ নয়। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ পাগল হয়ে গেলে সুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তালাক দিতে বা নিতে পারে। যদিও মানবিকতার দিকটিই অগ্রাধিকার প্রদান করা কর্তব্য হবে এবং স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়, স্বামীর দায়িত্ব হবে তার জন্য সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা *(বাজী, আল-মুন্তাক্বা ৪/১২১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২২৫)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমার হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী অসুস্থ। এক্ষণে আমি হজ্জে না গিয়ে প্রতিবেশীকে সাহায্য করলে হজ্জের ছওয়াব পাব কি?

-আতীকুল ইসলাম, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : ফরয হজ্জ হ'লে সেটাই প্রথমে আদায় করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দ্রুত (ফরয) হজ্জ সম্পাদন কর। কেননা কেউ জানে না তার ভাগ্যে কি ঘটবে' *(আহমাদ হা/২৮৬৯)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পাদন করে' *(আবুদাঊদ হা/১৭৩২; মিশকাত হা/২৫২৩)*। আর হজ্জের টাকা প্রতিবেশীর সাহায্যে ব্যয় করায় হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কেননা হজ্জ হ'ল ফরযে 'আয়েন এবং প্রতিবেশীকে সাহায্য করা হ'ল ফরযে কেফায়াহ। যা অন্য কেউ আদায় করলেও চলবে। তবে গরীব, অসহায় প্রতিবেশী বা অসুস্থ নিকটাত্মীয়ের জীবন রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনে ছাদাক্বা করা উত্তম এবং সেজন্য হজ্জ বিলম্ব করাও যেতে পারে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৮২৩; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়াহ ৪৬৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : বিবাহ ঠিক হওয়ার সময় শারঈ জ্ঞান না থাকায় মোহরানা অধিক পরিমাণে নির্ধারণ করা হয়। ছাত্রজীবনে থাকায় ব্যক্তিগত কোন উপার্জন নেই। ফলে পরিশোধেরও সামর্থ্য নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাবনা।

উত্তর : মোহরানা নির্ধারণ হবে ছেলের সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে। মোহরানার মালিক হ'ল স্ত্রী। এক্ষণে স্ত্রী চাইলে মোহরানার কিছু অংশ অথবা পুরোপুরি মাফ করে দিতে পারে। অতএব বিষয়টি স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/৪৪৯)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে, স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : আমাদের এলাকায় কেউ মারা গেলে তার বাড়িতে উন্নত খাবারের আয়োজন করা হয় এবং মৃতের জানাযায় উপস্থিত সকলকে খাওয়ানো হয়। এরূপ পদ্ধতি জায়েয কি?

-রওশন আলী, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃতের বাড়িতে এরূপ আনুষ্ঠানিকতার সাথে খাবারের আয়োজন করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এটি বিলাপের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৩৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৩৬৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৪০৪)*। জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, মৃতের বাড়িতে ভীড় জমানো ও খাদ্য প্রস্তুত করাকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম *(ইবনু মাজাহ হা/১৬১২; আহমাদ হা/৬৯০৫, সনদ ছহীহ)*। বরং শোকার্ত পরিবারকে প্রতিবেশীরা অন্ততঃ তিন দিন পর্যন্ত খাবার পাঠানোর চেষ্টা করবে এবং তাদেরকে মানসিক শক্তি যোগাবে। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদের বলেন, 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। কেননা তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১৭৩৯; ছহীহুল জামে' হা/১০১৫)*। তবে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন যারা আসেন তাদের খাবার ব্যবস্থাপনার জন্য মাইয়েতের বাড়িতে বা প্রতিবেশীদের দায়িত্বে মেহমানদারী করা যাবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৩২; মিশকাত হা/৫৯৪২; ইরওয়া হা/৭৪৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪১০; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান' বই)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : মসজিদে অনেক সময় মুছল্লীরা দুনিয়াবী গল্প-গুজব, হৈ-চৈ ইত্যাদি করে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-আমীনুর রহমান, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদ তো আল্লাহ্র যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*। সুতরাং মসজিদকে দুনিয়াবী গল্প-গুজবের স্থান বানানো যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা মসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল করবে না' *(মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৯)*। তিনি আরও বলেন, শেষ যামানায় লোকেরা মসজিদে গোল হয়ে বসবে। দুনিয়া হাছিলই তাদের উদ্দেশ্য হবে। তাদেরকে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। অতএব তোমরা তাদের সাথে বসবে না *(হাকেম হা/৭৯১৬, সনদ ছহীহ)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মসজিদে নববীর পার্শ্বে একটি বড় চত্বর বানিয়েছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল বুত্বায়হা বা বাত্বহা। তিনি লোকেদের বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উঁচু স্বরে (দুনিয়াবী) কথা বলবে, সে যেন ঐ চত্বরে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৪২২; মিশকাত হা/৭৪৫; বায়হাক্বী ১০/১০৩, হা/২০৭৬৩, সনদ ছহীহ; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার হা/৩৯৪)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : বিবাহিত নারী স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরত থাকলে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় কি? কতদিন এভাবে থাকা জায়েয?

-আতাউর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিতে যতদিন প্রয়োজন ততদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। এতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে

না। তবে স্বামীর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী যদি তাতে কোন কারণ ছাড়াই সাড়া না দেয়, তাহ'লে সে চরম অপরাধী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার উপর লা'নত করতে থাকে *(বুখারী হা/৫১৯৩)*। অপরদিকে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামী সর্বোচ্চ ছয় মাস বাইরে থাকতে পারে। এরপর স্বামী ফিরে না আসলে স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করতে পারে। এতেও স্বামী সম্মত না হ'লে স্ত্রী খোলা'র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং অন্যত্র বিবাহ করতে পারে *(বায়হাক্বী ৯/৫১, হা/১৭৮৫০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২৫৯৪)*। আর স্বামী যদি একেবারে নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহ'লে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করবে। এরপর নির্ধারিত চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৬৭২০; ইরওয়া হা/১৭০৮-১৭০৯, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : নিজ মায়ের প্রতি সন্তানের যে হক আদায় করা কর্তব্য সৎমায়ের জন্যও কি একই রকম হক আদায় করা আবশ্যক?

-শুভ, ঢাকা।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : সৎমায়ের মর্যাদা জন্মদাত্রী মায়ের সমান নয়। তবে পিতার স্ত্রী হিসাবে তিনি মাহরাম এবং সদাচরণ পাওয়ার হকদার। বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা' *(আবুদাঊদ হা/৫১৪২; হাকেম হা/৭২৬০; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়িদ বলেছেন। তবে আলবানী ও আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : মৃত ব্যক্তির সম্পদ কখন বণ্টন করতে হবে? এ ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-দেওয়ান কাওছার আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : মৃত্যুর পর সম্পদ বণ্টিত হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। ইমাম আহমাদ বলেন, কুরআনে বর্ণিত বিধি মোতাবেক মৃত্যুর পরেই মীরাছ বণ্টন করাকে আমি পসন্দ করি *(মুগনী ৬/৬১)*।

তবে ওয়ারিছদের সম্পদ গ্রহণ করার পূর্বে মাইয়েতের কোন অছিয়ত (সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ) এবং ঋণ থাকলে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, যদিও সমুদয় সম্পদ শেষ হয়ে যায় *(নিসা ৪/১১)*। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর পরপরই ওয়ারিছরা তার সম্পত্তির হকদার হয়ে যায়। অতএব যত দ্রুত সম্ভব সম্পদ বণ্টন করে নিতে হবে। তা না হ'লে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পর্ক নষ্ট হবে *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়াহ, ফৎওয়া নং ৪০৫৪৯০)*। অপরপক্ষে কেউ যদি মৃতের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজের আয়ত্তে রাখে এবং বণ্টনের সুযোগ না দেয়, তবে সে গোনাহগার হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : সরকারী চাকুরীর কারণে নির্বাচনের সময় সহযোগিতা করতে হয়। অথচ রাষ্ট্র আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে না। এক্ষণে বাধ্যগত কারণে এ দায়িত্ব পালন করলে কি কুফরী কাজে সহযোগিতার নামান্তর হবে? এজন্য ঢালাওভাবে কাউকে কাফের বলা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সরকারের যে কোন বৈধ কর্মে সহযোগিতা করায় কোন বাধা নেই। ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করলে সেজন্য সরকারই দায়ী থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেকেই স্বীয় অপকর্মের জন্য দায়ী হবে এবং কেউ অন্য কারো (পাপের) ভার বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। আর নির্বাচন কোন কুফরী কাজ নয়। অতএব এই দায়িত্ব পালন করলে তা কুফরী কাজে সহযোগিতা করা হবে না। এমনকি 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' বলা বা ধারণা করা কুফরী মন্তব্য হ'লেও উক্ত বাক্যের কারণে কোন মুসলমানকে ঢালাওভাবে কাফের বলা যাবে না। তারা ফাসেক হ'তে পারে কিন্তু ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত নয়। সূরা মায়েদাহ ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে বর্ণিত কাফের, যালেম ও ফাসেক-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকারকারী, সে কাফের। আর যে আল্লাহ্র হুকুমকে স্বীকার করে কিন্তু তা বাস্তবায়ন করে না বা কার্যক্ষেত্রে বিপরীত করে সে যালেম এবং ফাসেক *(ফাৎহুল ক্বাদীর ২/৪৫; তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : প্রত্যেক ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাসনূন দো'আ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু দো'আ নিজের প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে পাঠ করি। এভাবে নিয়মিত পাঠ করা বিদ'আত হবে কি?

-রেযওয়ান আহমাদ, মাতুয়াইল, ঢাকা।

উত্তর : বিদ'আত হবে না। তবে প্রথমে হাদীছে বর্ণিত মাসনূন দো'আসমূহ পাঠ করবে অতঃপর আম দো'আসমূহ পাঠ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ দো'আ করবে, তখন সে যেন প্রথমে তার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে দো'আ শুরু করে। তারপর যা চায় প্রার্থনা করে। কেননা ঐ ব্যক্তি সফল হওয়ার অধিক হকদার' *(ছহীহাহ হা/৩২০৪)*। তবে

প্রচলিত শিরকী ও বিদ'আতী দো'আ সমূহ হ'তে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : হিন্দুদের বাসায় দাওয়াত খাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক? বিশেষতঃ যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কামদেবপুর, মেহেরপুর।

উত্তর : হিন্দুদের বাসায় দাওয়াত খাওয়া জায়েয। তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে, যেমন- (১) তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। মূলতঃ মূর্তিপূজক, নাস্তিক প্রমুখ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করে, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; মায়েদাহ ৫/৩)*। (২) খাবারের পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কারণ অনেক সময় তারা একই পাত্রে শূকরের গোশত বা মদ পান করে। (৩) সেখানে যেন কোন মূর্তি বা বাদ্য-বাজনা না থাকে। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ এরূপ গৃহে প্রবেশ করতেন না *(বায়হাক্বী ৭/২৬৮ পৃ. হা/১৪৯৫৯ সনদ ছহীহ; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫-৬৬ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ৩৩)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : ইমাম ছাহেব এশার ছালাতের ক্বিরাআত সরবে না পড়ে নীরবে পড়েছেন। এরূপ ভুলের ক্ষেত্রে পিছন থেকে লোকমা দেওয়া যাবে কি?

-বিল্লাল হোসাইন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[বিল্লাল নয় 'বেলাল' নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : এশার ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পাঠ করতে হয় *(বুখারী হা/৭৬৯, মিশকাত হা/৮৩৪)*। এক্ষণে কেউ যদি ক্বিরাআত নীরবে পাঠ করে তাহ'লে মুক্তাদীরা লোকমা দিবে এবং ইমাম পুনরায় সূরা ফাতিহা থেকে পাঠ করবে। আর যদি এভাবেই এক রাক'আত শেষ হয়, তাহ'লে তার জন্য সহো সিজদা দেওয়া সুন্নাত। কারণ সে সুন্নাত পরিত্যাগ করেছিল *(হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জলীল ২/২৬)*। উল্লেখ্য যে, ছালাতের মধ্যে কোন সুন্নাত আমল ছুটে গেলে সহো সিজদা সুন্নাত, আর ওয়াজিব ছুটে গেলে সহো সিজদা ওয়াজিব হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৮১; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : মসজিদে সূদ বা অবৈধ ইনকামের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি? আর এর মাধ্যমে দাতা কোন নেকী পাবে কি?

-আমীনুর রহমান, বগুড়া।

উত্তর : পবিত্র সম্পদ থেকেই দান করা কর্তব্য *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। তবে কেউ যদি হারাম উপার্জন থেকে দান করে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৭)*। হারাম উপার্জনের জন্য দাতা দায়ী হবেন, গ্রহীতা নন। আল্লাহ বলেন, একের পাপ ভার অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। তাছাড়া প্রশ্নোল্লেখিত ব্যক্তির মত যদি কারু সম্পদে হালাল ও হারাম মিশ্রিত থাকে, তবে সেই সম্পদ গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে জায়েয *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*। কিন্তু হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে দান আল্লাহর নিকটে কবুল হয় না এবং এর মাধ্যমে দাতা কোন নেকীও পাবে না *(মুসলিম হা/২২৪, মিশকাত হা/৩০১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৮৫)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : মা মারা যাওয়ার পর তার নেকীর জন্য তার পক্ষ থেকে ওমরাহ পালন করা যাবে কি?

-ইব্রাহীম খলীল, সঊদী আরব।

উত্তর: মৃত মায়ের পক্ষ থেকে ওমরাহ করা যাবে। কারণ মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদাক্বা করা ও তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা *(আবুদাঊদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৫২৯১)*। আর ওমরাহ হ'ল হজ্জের মত। পার্থক্য হ'ল এটি বছরের যেকোন সময় করা যায়। আর আগে নিজে হজ্জ না করলে মায়ের বা অন্যের জন্য হজ্জ করা যায় না। কিন্তু ওমরাহর জন্য এটি শর্ত নয়।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট কত সময়?

-আব্দুল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটি সাধারণতঃ এক ঘন্টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২৭-২৮)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : আমার বয়স ৬৫ বছর। আমি আমার সৎ বোনের আপন নাতনীকে বিবাহ করেছিলাম। এখন আমার ৭ সন্তান। আমি বোনের নাতনী মাহরাম হওয়ার বিধান জানতাম না। এক্ষণে আমার করণীয় কী?

-আব্দুস সাত্তার
কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তর : বিধান জানার পর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আর একসাথে থাকার সুযোগ নেই; বরং এখুনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এজন্য কোন তালাকও দেওয়া লাগবে না। কারণ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। সৎবোনের নাতনী নিজের বোনের নাতনী সমতুল্য, যে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী *(নিসা ৪/২৩)*। উক্ত আয়াতে বোনের নাতনী ভাগিনেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৬৫; সারাখ্সী, আল-মাবসূত্ব ৩০/২৯১; আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৯/১২০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৮৪, ৩৮৭)*। এক্ষণে উক্ত সন্তানেরা ওয়ারিছ সাব্যস্ত হ'লেও মাহরাম হওয়ার কারণে স্ত্রী ওয়ারিছ হবে না। তবে সাধারণভাবে তাকে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদান করা যাবে। আর উক্ত ব্যক্তি এই অজ্ঞতাজনিত ভুলের জন্য খালেছ তওবা করবে এবং সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

প্রশ্ন (২১/২১) : জানাযার ছালাত জামা'আতের সাথে হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পায়ে পা মিলাতে হয় না কেন?

-আফযাল হোসাইন, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : জানাযার ছালাতেও যথারীতি পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলাতে হয়। এক্ষেত্রে জানাযার ছালাত ও সাধারণ ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(মুগনী ২/১৮৫, ২/৩৬৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২২-২৩, ১৭/১০)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : ছালাত অবস্থায় চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আমীরা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : অশ্রুপাত যদি আল্লাহভীতির কারণে হয়, তবে তা সর্বোত্তম এবং এটি আল্লাহভীরু বান্দাদের অন্যতম নিদর্শন *(আবুদাঊদ হা/৯০৪; নাসাঈ হা/১২১৪)*। তবে দুনিয়াবী কারণে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা যাবে না। এতে বরং ছালাত বাতিল হয়ে যাবে *(মুগনী ২/৪০-৪১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৮/১৭০-৭১)*। আর যদি কোন রোগের কারণে এমনটি হয়, তবে তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এটি ছালাত বিনষ্ট হওয়ার কোন কারণ নয়।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : আমার স্বামী পরহেযগার ও ইনছাফকারী। সার্বিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার বাধাতেই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। এভাবে কেবল ঈর্ষা ও ভালোবাসার কারণে তাকে বিবাহে বাধা দেওয়ার কারণে আমি গোনাহগার হব কি?

-উম্মে মারিয়াম, রাজশাহী।

উত্তর : সক্ষম স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এটি শরী'আতে বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার *(নিসা ৪/০৩)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উছায়মীন বলেন, কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দিবে। কারণ একাধিক বিয়ে করা স্বামীর অধিকার *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*। শায়খ বিন বায বলেন, একাধিক বিবাহ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ও উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যম এবং সার্বিক বিশৃংখলা ও ব্যভিচার থেকে বাঁচার উপায়। কারণ নারীরা কখনো অসুস্থ হয়; হায়েয, নিফাস বা গর্ভকালীন অবস্থায় বিপদগ্রস্ত থাকে। এসময় একাধিক স্ত্রী থাকলে একজন পুরুষ তার চাহিদা মিটাতে পারে এবং অনাকাংখিত পাপ থেকে সহজে বাঁচতে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়াল জামি'ইল কাবীর)*।

তাছাড়া সমাজে এমন অসংখ্য তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, অসহায় মহিলা রয়েছে, যারা নিরাপত্তাহীন কিংবা আশ্রয়হীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। তাদের দায়িত্ব নেয়ার মত কেউ নেই। এমতাবস্থায় সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে পুরুষদের একাধিক বিবাহে উৎসাহিত করা উচিৎ। যাতে সমাজের পরিবেশ সুন্দর হয় এবং বিবাহ বহির্ভূত অপকর্ম না ঘটে। সুতরাং স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হবে স্বামীকে একাধিক বিবাহে বাধা না দেওয়া এবং নেকীর কাজে তাকে সহযোগিতা করা।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : কোন ব্যক্তির সাথে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আবার সাক্ষাৎ হ'লে পুনরায় সালাম দিতে হবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সালাম দেওয়াই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলিম তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের উভয়ের মাঝে গাছ, দেওয়াল ও পাথর আড়াল হয়, অতঃপর আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, তাহ'লে তারা যেন পুনরায় সালাম দেয় *(আবুদাঊদ হা/৫২০০; মিশকাত হা/৪৬৫০; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৯; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৯৮)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : বর্তমান সমাজে মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ অভিভাবক মেয়েদের সর্বোচ্চ শিক্ষা ও চাকুরী করার আগ পর্যন্ত বিবাহ দিতে রাযী হন না। এরূপ মেয়েরা চরিত্র রক্ষার্থে পিতা-মাতার অমতে বিবাহ করতে চাইলে করণীয় কি?

-মেহেরুন নেছা, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : দ্বীনদার ও উপযুক্ত পাত্রের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসার পরও অভিভাবক বিবাহ না দিলে এবং সাবালিকা মেয়ের পূর্ণ সম্মতি থাকা সত্ত্বেও অভিভাবক অন্যায় যিদ করলে পরবর্তী অভিভাবক হিসাবে চাচা বা সাবালক ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এতেও ব্যর্থ হ'লে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩০/১৪৫; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৪৮)*। তবে স্মর্তব্য যে, কোনভাবেই গোপনে বা পরিবারের অজ্ঞাতসারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। কেননা বিবাহ হ'ল প্রকাশ্য বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিবাহের ঘোষণা দাও' *(আহমাদ হা/১৬১৭৫; ছহীহুল জামে' হা/১০৭২)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : মসজিদের দেওয়ালের কোন অংশে মুছল্লীদের স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে কালেমায়ে ত্বাইয়েবা, শাহাদত বা অন্য কিছু আরবীতে লেখা যাবে কি?

-যয়নব, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মসজিদের প্রাচীরে কোন কিছু লেখা সমীচীন নয়। বিশেষ করে সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন কিছু লেখা বা টাঙানো মোটেও ঠিক নয়। কারণ এতে মুছল্লীর মনোযোগ বিনষ্ট হ'তে পারে, যা ছালাতের আদবের খেলাফ। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মুছল্লী ছালাতের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে গোপনে আলাপ করে' *(বুখারী হা/৫৩১; মিশকাত হা/৭৪৬)*। তবে মুছল্লীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না এমন স্থানে মুছল্লীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ লিখে টাঙানো যায় *(বিন বায, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৮/১৯৭; ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ২/৭৭)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : সূদী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-নিশাত মাহমূদ, দিনাজপুর।

উত্তর : দরিদ্র বা অসহায় ব্যক্তিরা উক্ত শিক্ষাবৃত্তি নিতে পারে। কারণ সূদ মিশ্রিত টাকা উপার্জনকারীর জন্য হারাম হ'লেও গ্রহীতার জন্য হারাম নয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যখন হারাম সম্পদ দরিদ্র বা অসহায়দের প্রদান করা হয়, তখন তা গ্রহণ করা তাদের জন্য হারাম নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*। তবে এরূপ বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো মূলতঃ তাদের সূদী কার্যক্রমের প্রচারণা চালায়। অতএব সাধ্যমত এগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : আমি ৯০ হাযার টাকার বিনিময়ে ৩০ বছরের জন্য একটা জমি লিজ নেই। অতঃপর তা অন্য কারো কাছে বছরে ১০ হাযার টাকা করে লিজ দেই এবং প্রতি বছর ৭ হাযার টাকা অতিরিক্ত লাভ করি সেটা জায়েয হবে কি?

-রূহুল আমীন, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : ভাড়ায় নেওয়া বাড়ি অন্যত্র অধিক ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করা জায়েয। তবে যদি মালিকের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি থাকে তাহ'লে করা যাবে না। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কুদামাহ, যারকাশী, ইবনু রজব হাম্বলী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, ভাড়াটিয়া ভাড়াকৃত বস্তু সমমূল্যে বা অধিক মূল্যে অন্যত্র ভাড়া দিলে তা জায়েয হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪০৮; ইবনু রজব, আল-কাওয়ায়েদ ১৯৭ পৃ.; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/২৭৭; শারহুয যারকাশী ৪/২৩৪)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবর খনন, লাশ চুরির অপচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ঘটনা শোনা যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-সম্রাট হোসাইন, ড্রয়েট, গাযীপুর।
[নামের সাথে 'সম্রাট' যোগ করা ঠিক নয় (স.স.)]

উত্তর : এগুলির সত্যতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর দুই সাথী আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর লাশ চুরি করার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৪৩৫)*। কিন্তু প্রতিবারেই আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অন্ততঃ পাঁচ বার এরূপ অপচেষ্টা চালানো হয়েছে বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালিয়েছিল মিসরের শী'আ রাফেযী শাসক মানছূর বিন নিযার বিন মুঈদ। যে ৪০৮ হিজরীতে নিজেকে মা'বূদ বলে দাবী করেছিল। তৃতীয়বারে ৫৫৭ হিজরীতে সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর শাসনামলে মরক্কোর মুসলিমবেশী দু'জন খ্রিষ্টান সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়েছিল। ধরা পড়লে দু'জনকেই হত্যা করা হয় *(আবুল হাসান সামহূদী, অফাউল অফা ২/১৮৮)*। চতুর্থবার শামের একদল খ্রিষ্টান এই অপচেষ্টা করে। কিন্তু মসজিদে নববীর রক্ষীরা তাদের আটক করে ফেলে *(রিহলাতু ইবনুয যুবায়ের '৫৭৮ হিজরীর ঘটনাবলী' ৩৪-৩৫ পৃ.)*। পঞ্চমবার শামের চল্লিশ জনের একদল রাফেযী শী'আ রাত্রিবেলা মসজিদে নববীর বাবুস সালাম দরজা দিয়ে গর্ত খননের যন্ত্রপাতি সহ প্রবেশ করলে ওছমানী মিহরাবের নিকট মাটি ফেটে যায় এবং তারা সবাই সেখানে সমাহিত হয় *(অফাউল অফা ২/১৮৯)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : প্রতিবেশী গরীবদের কিছু দান করার জন্য নিজ পরিবারে কিছু ব্যয় সংকোচন করায় পরিবার বিষয়টি ভালো চোখে দেখছে না। তাদের মতে, সর্বোত্তম ব্যয় হ'ল নিজ পরিবারে ব্যয় করা। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পরিবারের জন্য ব্যয় করাই হ'ল মূল কর্তব্য। এব্যাপারে শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে খরচ করার পদ্ধতি বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহ'লে তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য। এরপর কিছু বাকী থাকলে অন্যান্য কাজে ব্যয় কর'। এ কথা বলে তিনি সামনে, ডাইনে ও বামে ইঙ্গিত করলেন *(মুসলিম হা/৯৯৭; মিশকাত হা/৩৩৯২ 'দাসমুক্তি' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে এসেছে, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, এক দীনার দাসমুক্তির জন্য ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে ছাদাক্বা কর এবং এক দীনার তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারে বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় করবে *(মুসলিম হা/৯৯৫; মিশকাত হা/১৯৩১ 'যাকাত' অধ্যায়)*। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে' *(আল আদাবুল মুফরাদ হা/১১২; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহাহ হা/১৪৯)*। অতএব পরিবারিক ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি গরীব প্রতিবেশীর প্রতি অবশ্যই সুদৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : পিতা-মাতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে দিতে চায়। তাদের এই নির্দেশ অমান্য করলে আমি গোনাহগার হব কি?

-আব্দুস সালাম, পিরোজখালি, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে বিবাহ দেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। এজন্য সাবালক ছেলে-মেয়ের সম্মতি আবশ্যক। জনৈকা সাবালিকা মেয়েকে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিবাহ দিলে রাসূল (ছাঃ) মেয়ের আপত্তির কারণে উক্ত বিবাহ বাতিল করে দেন *(বুখারী হা/৬৯৪৫; মিশকাত হা/৩১২৮, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩)*। অতএব পিতা ও মেয়ে উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি ও পিতার অনুমতির মাধ্যমে বিয়ে হ'তে হবে। তবে সাবালক ছেলে স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাকে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭)*। জোরপূর্বক বিবাহ দিলে ছেলে বা মেয়ে তা ভেঙ্গে দিতে পারে এবং এতে সে গোনাহগার হবে না। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, পিতা-মাতার জন্য সমীচীন নয় যে, ছেলের বিবাহ এমন মেয়ের সাথে দিবে যাকে সে চায় না। এমন বিবাহ যদি সে অমান্য করে তাহ'লে সে অবাধ্য হিসাবে গণ্য হবে না *(ইবনু*

তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩০)। তবে যদি এমন হয় যে, পিতা-মাতা একজন দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহের জন্য ঠিক করেছেন, কিন্তু বৈষয়িক কারণে ছেলের সেটি পসন্দ নয়। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যক। বিবাহ না করলে সে অবাধ্য সন্তান হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই মৃত। তাদের ওয়ারিছ পাওয়া যায় না। এক্ষণে ঋণগ্রহীতার ওয়ারিছগণ ঋণদাতার উক্ত ঋণ কিভাবে পরিশোধ করবে?

-রাক্বীবুল আলম, পাবনা।

উত্তর : প্রথমে ওয়ারিছ খুঁজে বের করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। যদি কোনভাবেই না পাওয়া যায় তাহ'লে উক্ত সম্পদ তার নামে বায়তুল মাল বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দিবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩২১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১০/৩৮৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১১/২২৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : জনৈক আলেম বলেন, বিবাহের অলীমা কবে করতে হবে সে বিষয়ে শরী'আতে কোন নির্দেশনা নেই। একথার সত্যতা আছে কি?

-সাদ্দাম হোসাইন, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : অলীমা বিষয়ে শরী'আতের নির্দেশনা হ'ল বাসর রাতের পরের দিন অলীমা করা। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পর দিন অলীমা করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৭০)*। রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়াহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনদিন যাবৎ অলীমা করেছিলেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, সনদ হাসান)*। তবে কারণবশতঃ অলীমার দিন বিলম্বিতও করা যায়। রাসূল (ছাঃ) অলীমার সময়কে এক বা দুই দিনের জন্য খাছ করেননি *(বুখারী ১৭/২৬৫)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অলীমার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেননি যেদিন অলীমা করাকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলা হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৬)*। তাছাড়া ছাহাবী উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-কে সপ্তম দিনে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হ'লেও তিনি কবুল করেন *(ফাৎহুল বারী ৯/২৪৩)*। অতএব তিন দিন পর্যন্ত অলীমা করা সুন্নাত। আর তা সম্ভব না হ'লে যত দ্রুত সম্ভব সুবিধামত দিনে অলীমা করবে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : কারো মনের অজান্তে মুখ দিয়ে কুফরী বা শিরকী কথা বেরিয়ে গেলে সে কি কাফের বা মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে?

-মা'ছুম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : মনের অজান্তে কারো মুখ থেকে কুফরী বা শিরকী কথা বেরিয়ে গেলেই সে কাফির বা মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাকে দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন এই মর্মে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অজ্ঞতাবশে ভুল করি, সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ছহীহুল জামে' হা/১৭৩১)*। তবে সর্বদা কুফরী বা শিরকী কথার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে মুখ দিয়ে এমন বাক্য বের না হয়। রাসূল (ছাঃ) প্রকাশ্য-গোপন সর্বপ্রকার শিরক থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতেন- اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ، 'হে আল্লাহ! জেনেশুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজ্ঞতাবশে শিরক করা থেকে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩১)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : জনৈকা গর্ভবতী নারী মাটি বা মাটির তৈরী পাত্র চিবিয়ে খায়। এরূপ মাটি খাওয়া জায়েয হবে কি?

-ইহসান এলাহী যহীর, কুমিল্লা।

উত্তর : মাটি কোন খাদ্য নয়। এতে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হ'তে পারে। সেজন্য বিদ্বানগণ মাটি, পাথর ও কয়লা ভক্ষণ করাকে হারাম বলেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৭; রওযাতুত ত্বালেবীন ৩/২৯১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৪২৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৫/১২৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : 'জিব্রীল (আঃ) বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে সৃষ্টির পর আমি দশ বছর অপেক্ষায় ছিলাম। এরপরেও আমার নাম জানতাম না। এরপর একদিন আল্লাহ আমাকে জিব্রীল বলে ডাক দিলেন। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমার নাম জিব্রীল'-উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আল-আমীন, ভুগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : আব্দুর রহমান ছাফূরী তাঁর 'নুযহাতুল মাজালেস' *(২/৮৪-৮৫)* গ্রন্থে উক্ত মর্মে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই; বরং জাল ও বানোয়াট।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : আমার পিতার মৃত্যুর পরে সবার মাঝে সম্পত্তি বণ্টন হয়ে যায়। কিছুদিন পর জানা যায় তার আরো কিছু সম্পদ রয়েছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল হান্নান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত সম্পদ মীরাছ অনুপাতে সকলে পুনরায় ভাগ করে নিবে। অথবা সকল ওয়ারিছের সম্মতিক্রমে তা মৃতের নামে দানও করা যেতে পারে। তবে কারো আপত্তি থাকলে দান করা যাবে না। কারণ ওয়ারিছগণ সকলেই উক্ত সম্পদের মালিক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৪৫৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১১/১৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : পায়খানার দ্বার দিয়ে কৃমি বের হ'লে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-কাওছার, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল না থাকলেও বিদ্বানগণ একমত যে, পায়ুপথ দিয়ে যা কিছু বের হবে তাতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২৩০)*। অতএব কৃমি, নুড়ি, চুল, গোশতের টুকরা বা অনুরূপ কিছু সবই অপবিত্র হিসাবে গণ্য হবে। এর উপরেই ফৎওয়া দিয়েছেন সুফিয়ান ছওরী, ইসহাক, আত্বা, হাসান বছরী প্রমুখ, যদিও ইমাম মালেকসহ কতিপয় বিদ্বান ভিন্নমত পোষণ করেছেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৭/১১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে (বায়ু বের হবার) কোন শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়' *(বুখারী হা/১৩৭, মুসলিম হা/৩৬২, মিশকাত হা/৩০৬)*। অর্থাৎ বায়ু বের হওয়ার কারণে যখন ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে কৃমি বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হওয়া অধিক যৌক্তিক *(উছায়মীন, তা'লীক্বাত 'আলাল কাফী লি ইবনে কুদামাহ ১/১২৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : শরী'আতে সমালোচনার আদব সম্পর্কে জানতে চাই। বিশেষত জ্ঞানী ব্যক্তির সমালোচনার ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সমালোচনার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পালন করা কর্তব্য। যেমন- (১) নিয়ত বিশুদ্ধ থাকা : অর্থাৎ সমালোচনা হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুমিন তাঁর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সে তার কোন ধরনের ভুল দেখলে সংশোধন করে দেয়' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/৯২৬)*। (২) কল্যাণকামী হওয়া : সমালোচনা হ'তে হবে মানুষের প্রতি নছীহত হিসাবে। বিরাগ বা বিদ্বেষবশত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হ'ল নছীহত *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬)*। (৩) নম্র ভাষা ব্যবহার করা : সমালোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে শালীন ও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ফেরাঊনের ব্যাপারে আল্লাহ মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে বলেন, 'অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা, ২০/৪৪)*। (৪) উত্তমভাবে বলা : আল্লাহ বলেন, 'মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। (৫) অর্থহীন তর্ক এড়িয়ে যাওয়া : অর্থহীন তর্ক ও সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, 'আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে বলে দাও যে, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন' *(হজ্জ ২২/৬৮-৬৯)*। (৬) সম্ভব হ'লে পরিচয় গোপন করা : সমালোচিত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় গোপন রেখে তাঁর ভুলগুলো আলোচনা করা ভাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যখন তাঁর কোন ছাহাবীর ব্যাপারে কোন অভিযোগ আসত, তখন তিনি বলতেন না যে, অমুকের কি হ'ল? বরং তিনি বলতেন, মানুষের কি হ'ল যে তারা এমন কাজ করে! *(নাসাঈ হা/৩২১৭; আবুদাউদ হা/৪৭৮৮; ছহীহাহ হা/২০৬৪)*। (৭) গোপনে সংশোধনের চেষ্টা করা : একান্তে ও গোপনে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা ইসলামের শিষ্টাচার। তবে যখন মুসলমান ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন প্রকাশ্যে সমালোচনা করা যাবে। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'মুমিন (মুমিনের দোষ) গোপন করে এবং তাকে উপদেশ দেয়। পাপিষ্ঠ তা প্রকাশ করে এবং লজ্জিত করে *(ইবনু রজব, জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/৮২)*। (৮) মূর্খদের প্রতিপক্ষ না বানানো : বিপরীত পক্ষের লোক অজ্ঞ বা মূর্খ হ'লে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সমালোচনা পরিহার করা উচিৎ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩; বিস্তারিত দ্র. রায়েদ আমীর আব্দুল্লাহ রাশেদ, আন-নাকদু বাইনাল বিনা ওয়াল হাদম পৃ. ৪৯)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : পাকা চুল উঠিয়ে ফেলায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-কাদেরুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : পাকা চুল উঠানো যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হ'ল মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'সনদ হাসান')*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী হা/১৬৩৫, মিশকাত হা/৪৪৫৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এগুলি উপড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	২৩ ছফর	১৬ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	২৫ ছফর	১৮ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৬	০৫:৫০	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	২৭ ছফর	২০ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	২৯ ছফর	২২ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	০২ রবীঃ আউঃ	২৪ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	০৪ রবীঃ আউঃ	২৬ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	০৬ রবীঃ আউঃ	২৮ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৪০	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	০৮ রবীঃ আউঃ	৩০ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৮
১৭ অক্টোবর	১০ রবীঃ আউঃ	০১ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪১	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৩	০৫:৩১	০৬:৪৬
১৯ অক্টোবর	১২ রবীঃ আউঃ	০৩ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪২	০৫:৫৭	১১:৪৩	০৩:০২	০৫:২৯	০৬:৪৫
২১ অক্টোবর	১৪ রবীঃ আউঃ	০৫ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৩	০৫:৫৮	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৮	০৬:৪৩
২৩ অক্টোবর	১৬ রবীঃ আউঃ	০৭ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৪	০৫:৫৯	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৪২
২৫ অক্টোবর	১৮ রবীঃ আউঃ	০৯ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৫	০৬:০০	১১:৪২	০২:৫৮	০৫:২৫	০৬:৪০
২৭ অক্টোবর	২০ রবীঃ আউঃ	১১ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪২	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৩৯
২৯ অক্টোবর	২২ রবীঃ আউঃ	১৩ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৬	০৬:০২	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২২	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	২৪ রবীঃ আউঃ	১৫ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৭	০৬:০৩	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭
০১ নভেম্বর	২৫ রবীঃ আউঃ	১৬ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	২৭ রবীঃ আউঃ	১৮ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৯	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	২৯ রবীঃ আউঃ	২০ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫০	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	০১ রবীঃ আখের	২২ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫১	০৬:০৮	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	০৩ রবীঃ আখের	২৪ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	০৫ রবীঃ আখের	২৬ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	০৭ রবীঃ আখের	২৮ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫৪	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	০৯ রবীঃ আখের	৩০ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-২
গাযীপুর	০	০	০	-১	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	+১	০	+১
ময়মনসিংহ	+১	০	-১	-১	০
জামালপুর	+২	+২	+১	০	+১
নেত্রকোণা	-১	-১	-২	-৩	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+৩	+৩	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+১	+১	+১	+১	+১
পটুয়াখালী	+১	০	+১	+১	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২	+২	+২
বরিশাল	০	০	০	০	০
ভোলা	-১	-১	-১	-১	-১
বরগুনা	+১	+১	+২	+২	+১

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+৩	+৩	+৪
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৭	+৯
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৪	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৮	+৮	+৬	+৫	+৭
দিনাজপুর	+৮	+৭	+৬	+৫	+৭
লালমণিরহাট	+৪	+৪	+৩	+২	+৩
নীলফামারী	+৭	+৬	+৫	+৪	+৬
গাইবান্ধা	+৪	+৪	+৩	+২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৮	+৭	+৬	+৭
রংপুর	+৫	+৫	+৩	+৩	+৪
কুড়িগ্রাম	+৪	+৩	+২	+১	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৪	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩	-৪	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৭	-৭	-৭	-৭
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১	-১
লক্ষীপুর	-১	-২	-২	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৫	-৫	-৫	-৬
কক্সবাজার	-৬	-৬	-৬	-৫	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৬	-৬	-৬
বান্দরবান	-৭	-৭	-৭	-৭	-৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৭	-৭	-৬
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৬	-৭	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৫	-৪
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৫	-৪

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা
- ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা
- রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্য
- নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ
- গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম
- জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব সমূহ

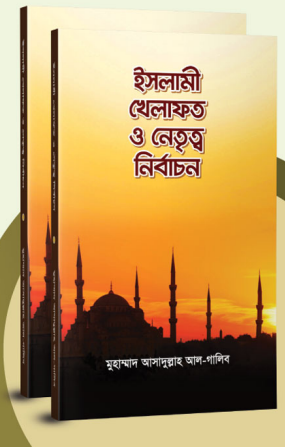

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

www.at-tahreek.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

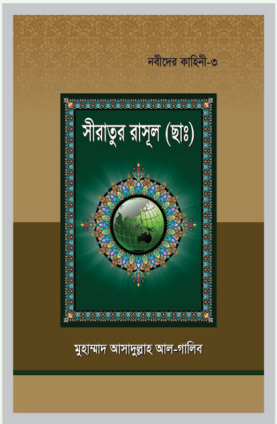

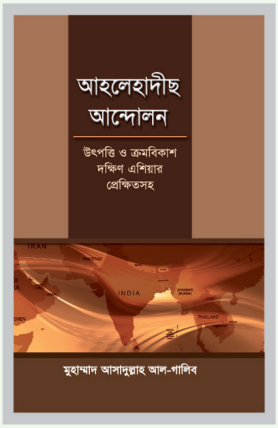

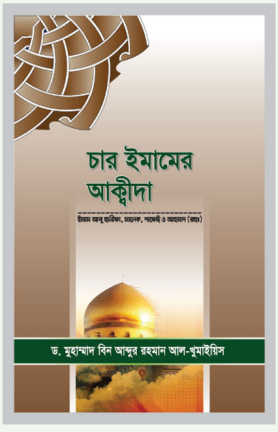

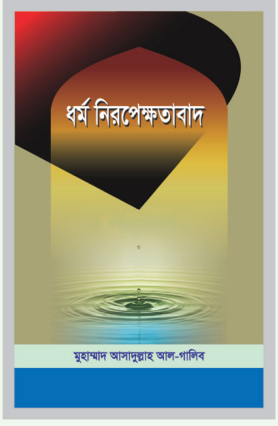

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আম চত্বর), মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ০১৮৩৫-৪২৩৪১০
www.hadeethfoundationbd.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১